চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ

সম্পাদকীয়

ছোট ভাইবোনেরা,

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের ফেব্রুআরি সংখ্যা তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ চার্লস ডিকেন্সের 'গ্রেট এক্সপক্টেসনস' তোমাদের নিশ্চয় ভালো লাগবে। এছাড়া আছে 'গোগোলে'র নতুন অ্যাডভেঞ্চার। অদ্রীশ বর্ধনের বোতল লিপিকার কাহিনী। ধারাবাহিক 'বিষাক্ত ওষুধ রহস্য' ছাড়া টারজানের নতুন কমিকস্ সিরিজ শুরু হচ্ছে এই সংখ্যা থেকে। অন্যান্য নিয়মিত ফিচার আছেই। তাছাড়া আছে ছবি আঁকা ও গল্প লেখা প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টার ত্রুটি রাখা হয় নি।

অমিতাভ সেন
প্রধান সম্পাদক

বিঃ দ্রঃ

পূজা সংখ্যায় যে প্রতিযোগিতা দেওয়া হয়েছিল, পুরস্কার পাঠানো হয়েছে।

সোহিনী প্রকাশনী ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১
দাম—দুই টাকা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত
শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র

কিশোরদের একমাত্র গোয়েন্দা মাসিক পত্র

বিস্ময়কর কাহিনী
সমরেশ বসু / গোগোলের সঙ্গে বুনো হাতি ১৩১
রহস্য উপন্যাস
নীহাররঞ্জন গুপ্ত / বাদশাহী মোহর ১১০
রোমাঞ্চকর সেরা কিশোর কাহিনী
মহাশ্বেতা দেবী / রাজপুরীর রহস্য ১১৪
দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনী
অদ্রীশ বর্ধন / বোতল লিপিকার বিচিত্র কাহিনী ১২৪

চার্লস ডিকেনস
গ্রেট এক্সপেক্টেসনস্
ভাষান্তর : ডাঃ অভিজিৎ দত্ত ১৫৭

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী / ছায়া মূর্তি ১২৯
একটু হাঁসো / কমিকস ১৬৯
কমিকস সিরিজ / বিষাক্ত ওষুধ রহস্য (৩) ১৬৭
টারজান কমিকস / ফাঁদ (১) ১৪৫
সোহিনী পাল / মনে রেখো ১৭১
বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য / খেলা ধুলা ১১৩
মিস ব্যানার্জী / প্রশ্নোত্তর ১৪৪
প্রতিযোগিতা / ছবি আঁকা ও গল্প লেখা ১৭৭

সর্বাধিক জনপ্রিয়

একমাত্র কিশোর গোয়েন্দা মাসিক পত্র

চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ

আগামী সংখ্যায় আরও একটি আশ্চর্য সিরিজ

মমির রহস্য

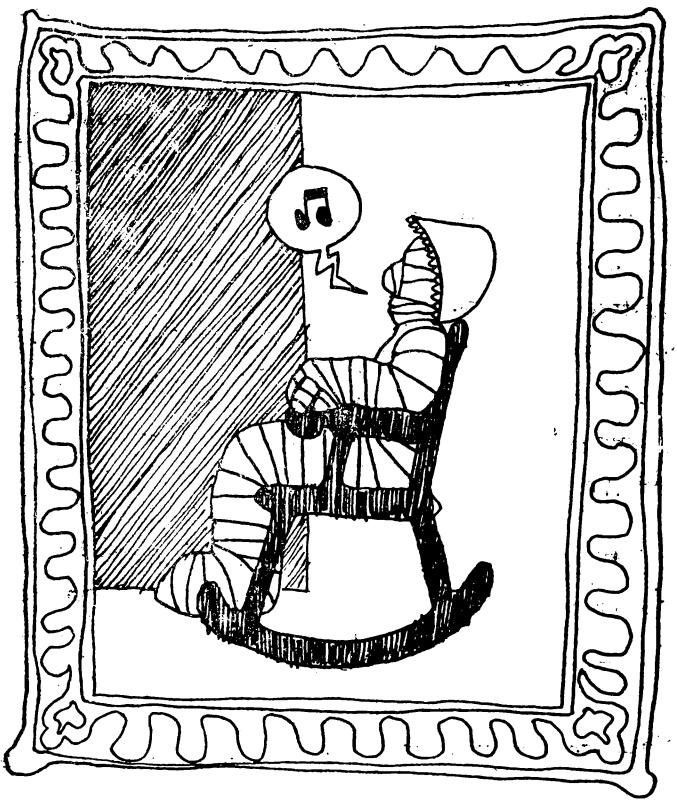

আরও আকর্ষণীয় একটি লেখা সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ করবে

কিশোরদের রোমহর্ষক চাঞ্চল্যকর গোয়েন্দা কাহিনী

পুতুলের প্রতিশোধ

লিখবেন : অমিতাভ সেন

দাম দুটাকাই থাকবে।

[আগের কথা : বিপ্লবদের পুরোন বাড়ি কিনতে এসে মাঝরাতে দরজার গোড়ায় একজন খুন হল। রাতের অন্ধকারে লাস উধাও। ওসি কিরণ লাহিড়ী বিপ্লব ও তার মা রত্নাদেবীকে সন্দেহ করছেন। এক লাখ টাকা ভর্তি একটা সুটকেশ পাওয়া গেছে। বিপ্লব সত্য সন্ধানী বিরূপাক্ষ সেনকে নিয়ে এলো। একটা লাশ সনাক্ত করে থানা থেকে ফেরার পথে বিপ্লব ও তার মাকে অপহরণ করা হল। ওরা রত্নাদেবীকে ছেড়ে দিল। বিপ্লবকে নিয়ে চলল। রত্না দেবী বাড়ি ফিরতেই একজন এলো সেখানে। রত্নেশ্বর রায়ের ছেলে বীরেশ্বর। বাড়ির ভেতরে গিয়ে কথা বলতে চায়।]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ট্যাক্সীটা ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড ধরে কলকাতার দিকে ছুটছিল।

ঘোষাল ও অন্য লোকটা ট্যাক্সীর পিছনের সিটে বিপ্লবকে মাঝখানে বসিয়ে দু'জনে দুপাশে বসেছিল এবং ইতিমধ্যেই বিপ্লব প্রচণ্ডভাবে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবের হাত দুটো বেঁধে দিয়েছিল এবং যাতে করে না চেঁচাতে পারে বা কোন গোলমাল না করতে পারে মুখটাও একটা বড় রুমাল দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল।

ষণ্ডামত ট্যাক্সী ড্রাইভারটাও ওদের সাহায্য করেছিল বিপ্লবকে বাঁধবার সময়। মিলিত একত্রে তিনজনের শক্তির কাছে বাধ্য হয়েই বিপ্লবকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

বিপ্লব বুঝেছিল আপাততঃ ওদের তিনজনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান ওর একার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই সে বাঁধা অবস্থায় চিন্তা করছিল—সমস্ত ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করছিল, ঐ অবস্থায় কি করতে পারে সে। তার একার পক্ষে কি করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছিল।

সন্ধ্যা নামছে।

আর একটু পরে রাত্রি নামবে এবং কলকাতায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। কারা যে ঐভাবে তাকে হাত ও মুখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে বিপ্লব সেটাই ভাবে। কেনই বা ওরা তাকে ঐ ভাবে ধরে নিয়ে চলেছে। ভাগ্য ভাল যে মাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে—মা নিশ্চই বাসে করে কলকাতায় পৌঁছে যাবে। তারপর বিরূপাক্ষ সেনের সঙ্গে মা দেখা করবে।

শ্যামপুকুর থানার ওসি কিরণ কাকাবাবুকেও কি মা একটা খবর দেবে না। কিন্তু ওদের খবর দিয়েই বা কি হবে।

এই লোকগুলো ওকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে কথাটা ওরা জানবে কি করে। সেটাও একটা চিন্তা।

আট

রাত আটটা নাগাদ ট্যাক্সীটা এসে বেলগাছিয়া অঞ্চলে ব্রিজটার কিছু দূরে দাঁড়াল। ঘোষাল ও অন্যলোকটা ওকে দু'হাত ধরে গাড়ি থেকে টেনে নামাল।

কিছুদূর এগোতেই একটা গলি। গলির মধ্যে টিম টিম করে আলো জ্বলছে, একটা আলো আঁধারী। বিশেষ কোন মানুষজন চোখে পড়লো না বিপ্লবের। কোন বাধা দিল না বিপ্লব। ওদের সঙ্গে সঙ্গে চললো। রাতও মাত্র সবে আটটা কিন্তু ঐ সন্ধ্যা রাতেই মনে হয় জায়গাটা যেন কেমন নিঝুম হয়ে গিয়েছে, বুঝি মধ্যরাত্রি।

একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। বন্ধ দরজার কড়াটা খট্ খট করে নাড়তেই দরজাটা খুলে গেল, কে ?

বিষণ সিং—আমি, ঘোষাল। বাবু আছেন ?

না—

নেই।

না সেই দুপুরে বের হয়েছেন এখনো ফেরেন নি।

ঠিক আছে—চলো, দরজা বন্ধ করে দাও।

ওরা বিপ্লবকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকবার পর বিষণ সিং দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

বাড়িটার ভিতর দেখে মনে হয় বাড়িটা পুরাতন অনেককালের, দেওয়ালে নোনা ধরেছে চাবড়া চাবড়া প্লাসটার এখানে ওখানে খসে খসে পড়েছে।

সামনেই একটা প্যাসেজ তারপরেই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি।

চল্ উপরে চল, ঘোষাল বিপ্লবকে একটা ধাক্কা দিল সামনের দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা সরু বারান্দা। সামনেই পর পর তিনটা ঘর। একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালাল ঘোষাল।

রাখাল, ওর মুখের আর হাতের বাঁধন খুলে দে ঘোষাল বললে।

দ্বিতীয় লোকটাই রাখাল—সে বিপ্লবের হাতের ও মুখের বাঁধন খুলে দিল।

এতক্ষণ বাঁধা থাকায় হাত দুটো টন টন করছিল বিপ্লবের।

মুখটাও ব্যথা করছিল।

বিপ্লব ঘরের চারপাশে একবার তাকাল।

ঘরটা আকারে ছোট। একপাশে একখানা খাট পাতা তার উপর সতরঞ্জী জড়ানো একটা বিছানা। অন্য পাশে ছোট একটা কাঠের টেবিল ও একটা লোহার চেয়ার।

এক কোণে একটা জলের কুজো তার উপর উপুড় করা একটা কাঁচের গ্লাস।

ঘোষাল বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে বললে, বাবু এলে তোমার যা ব্যবস্থা করতে বলবেন হবে, ইতিমধ্যে ত্যাদড়ামি করার চেষ্টা করো না, বাবু যদি তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেন, ছেড়ে দেওয়া হবে।

—কে তোমাদের বাবু।

—সেত এলেই দেখতে পাবে।

—কি নাম তার—

—তাকেই শুধিয়ো কি নাম তার।

—আমাকে ধরে নিয়ে এলে কেন।

—বাবুর কাছ থেকেই জেনে নিও। বিষণ সিং—হামি ঘোষাল।

বিষণ সিং এসে ঘরে ঢুকল।

থোড়া চা বানাও। ঐ ছেলেটা যদি চা খায় ওকেও দিও, রাখাল আর আমি পাশের ঘরেই আছি। কথাগুলো বলে দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিল।

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো বিপ্লব তারপর একটা বন্ধ জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

জানলার পাল্লা দুটো টেনে খুলতেই বিপ্লবের চোখে পড়ল আবছা অন্ধকার। দূরে রেলওয়ে ইয়ার্ড-কিছু ওয়াগান এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে, একটা এনজিন কিছু ওয়াগান টেনে টেনে সানটিং করছে। তার শব্দ শোনা যায়। দূরে ব্রিজটাও চোখে পড়ে।

বাস লরি প্রাইভেট কার এদিক ওদিক যাতায়াত করছে।

বিপ্লব বুঝতে পারে ওরা তাকে আপাততঃ বন্দী করেছে। কেন বন্দী করে ওরা তাকে এখানে নিয়ে এলো সেটাই বুঝতে পারে না বিপ্লব, জানলার শিক নাড়াবার চেষ্টা করলো কিন্তু পুরাতন মরচে পড়া হলেও শক্ত, ঐ পথে পালাবার কোন উপায় নেই।

কে এক বাবু আসবে তারপর স্থির হবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা।

বাবুটাই বা কে!

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে শিকল খোলার শব্দ হলো। দরজা খুলে গেল।

ঘোষাল ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

চল, বাবু তোমাকে ডাকছেন।

বিপ্লব নিঃশব্দে একবার তাকাল ঘোষালের মুখের দিকে। কোন কথা বলল না, ঘোষাল-কে অনুসরণ করে বিপ্লব ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

পাশের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। দরজায় একটা পর্দা ঝুলছে এবং ভিতরে আলো জ্বলছে বোঝা যায়।

ঘোষাল বলল, এসো—

পর্দা তুলে ঘোষাল প্রথমে ঘরে প্রবেশ করলো এবং তার ইঙ্গিতে বিপ্লবও ঘরে ঢুকল।

সুন্দর ছিম ছাম করে ঘরটা সাজান।

একটা টিউব লাইট জ্বলছে, তারই উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা ঝলমল করছে।

বিপ্লবের নজরে পড়ল একটা চেয়ারে কে উপবিষ্ট আছে। তার মাথার উপরি ভাগ দেখা যাচ্ছে, একটা ধোয়ার রেখা উপরে উঠছে।

সার ঘোষাল ডাকল।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা ঘুরে গেল। এবং এবার বিপ্লব

দেখলো মধ্যবয়সী একটি লোক—পরনে দামী সুট ঠোঁটের উপরে সরু গোঁফ চোখে চশমা।
মুখে একটা জ্বলন্ত চুরোট—
লোকটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বিপ্লবের মুখের দিকে চেয়ে রইলো তারপর ঘোষালকে উদ্দেশ করে বললে ঘোষাল, তুমি বাইরে যাও, দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিও।
ঘোষাল কোন কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে দরজার পাল্লা দুটো টেনে দিল।
লোকটি কোন কথা বলবার আগেই বিপ্লব বললে, আমাকে এখানে এ ভাবে ধরে এনেছেন কেন।
এনেছি যখন, এখুনি জানতে পারবে। শোন বিপ্লববাবু, তুমি যদি আমি যা বলবো করো ত এখুনি তোমাকে ছেড়ে দেবো, আমার লোক তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।
কি কাজ।
বলছি—
আর যদি আমি কাজটা না করি—
তাহলে বলবো তুমি বুদ্ধিমান হয়েও মিথ্যে ঝামেলা টেনে আনবে একটা।
তাই বুঝি।
হ্যাঁ—কি করবেত বলি।
বলুন, শোনাই যাক।
তোমাদের ঐ বাড়িটা আমি কিনতে চাই—দেড় লাখ টাকা দাম দেবো। কাজটা হচ্ছে একটা দলিল করে রেখেছি দশ হাজার টাকা advance নিয়ে সেই দলিলে তুমি একটা সই করে দেবে।
কিন্তু বাড়ির মালিকত আমি নই। মা—
তা জানি তুমি সই করলে রত্না দেবীও সই করবেন।
কি করে বুঝলেন—মা সই করবেন—
করবেন।
মাকে তাহলে আপনি চেনেন না—
ঐ দলিলের ব্যাপারেই চেনা পরিচয় হবে—কি বল এখন রাজী।
—না।
—বিপ্লববাবু—
—না—
—হ্যাঁ একবার ব্যাপারটা ভেবে দেখো একটা পুরাতন বাড়ির জন্য দেড় লাখ টাকা দিচ্ছি—
—দশ লাখ দিলেও আমার ঐ একই জবাব
—তাহলে
—না।
—এই তোমার শেষ কথা।
—হ্যাঁ final কথা।
—হুঁ ঠিক আছে—বিষেণ সিং
বিষেণ সিং এসে ঘরে ঢুকল, হুজুর—
—একে নিয়ে গিয়ে নীচের কয়লার ছোট ঘরটায় বন্দীকরে রাখ। দু'দিন কিছু খেতে দিবি না, যা—
—চল, বিষেণ সিং বললে।
—তমিজান বাত কর,
—যা নিয়ে যা—
বিষেণ সিং এগিয়ে বিপ্লবকে ধরবার চেষ্টা করতেই বিপ্লব একটা জুজুৎসুর প্যাঁচ কষলো, বিষেণ সিং তার বিরাট দেহটা নিয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

[ক্রমশঃ]

খেলা ধূলা

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

[ইংলণ্ডের প্রথম ভারত সফর : ১৯৩২-৩৩ সালে ডাগলাস জার্ডিনের নেতৃত্বে ষোলজন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট দল সব প্রথম ভারত সফরে এসেছিল। সেই থেকে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে টেস্ট পর্যায়ের খেলা শুরু। সি কে নাইডুর নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড সহজেই জয়লাভ করে। কলকাতায় ইডেন উদ্যানে দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। মাদ্রাজে তৃতীয় ও শেষ টেস্টে ইংলণ্ড ২০২ রানে জয়লাভ করে।]

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ও শেষ টেস্টে ভারতীয় দলে দুজন খেলোয়াড় পরিবর্তন হয়। মুস্তাক আলী এবং গোপালনের জায়গায় পাতিয়ালার যুবরাজ যাদবেন্দ্র সিং এবং নাজীর আলী দলে আসায় সি. কে, সি. এস নাইডু এবং ওয়াজীর আলী এবং নাজীর আলী দু-জোড়া ভাই একই সাথে টেস্ট খেলে সুন্দর নজীর স্থাপন করেন। এদিকে অকস্মাৎ অসুস্থতার জন্য খেলতে অপারগ হওয়ায় নিসারের স্থানে মুস্তাক আলীর প্রত্যাবর্তন হয়। তৃতীয় টেস্টেও টসে জেতে ইংল্যাণ্ড। ইনিংসের সূচনা করে বেকওয়েল ও ওয়াল্টার্স। নিসারের অনুপস্থিতিতে ভারতের বোলিং শক্তি যে বেশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে স্কোর বোর্ডের দিকে চোখ পড়লেই তা প্রমাণ হয়। ইংল্যাণ্ডের প্রথম উইকেটটি পড়ে ১০১ রানে।

অমর সিং মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ২১ ওভারে ৫টি মেডেন সহ ৪৮ রানের বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডের চারটি উইকেট ছিনিয়ে নেবার পর চা পানের সময় পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ৬টি উইকেট হারায় ৯৭ রানে। ৭টি উইকেটের বিনিময়ে ২০৮ রান সংগৃহীত হবার পর দলপতি জার্ডিন দলের হাল ধরেন। জার্ডনের সাথে সুন্দর সহযোগিতা করেন ভেরিটি। ব্যক্তিগত ২ রানের মাথায় আউট হবার মুখে পড়েও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়ে ভেরিটি সংগ্রহ করেন ৪২ রান। ১৩৫ মিনিট উইকেটে থেকে জার্ডিন করেন ৬৫ রান। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩৩১ রানে। বোলার হিসেবে প্রথম ইনিংসে সবচেয়ে সফল হন অমর সিং ৪৪.৪ ওভার বল করে ১৩টি মেডেন নিয়ে ৮৬ রানের বিনিময়ে অমর সিং হস্তগত করেন ৭ খানি উইকেট। অমর সিংয়ের পর অমরনাথ ২টি ও মুস্তাক আলী ১টি করে উইকেট দখল করেন।

ইংল্যাণ্ডের ৩৩১ রানের মোকাবিলা করার শুরু থেকেই ভারতের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। প্রথম উইকেটটি ১৫ রানে পড়ে যাবার পর বাদবাকী উইকেট গুলোতে যোগ হয় মাত্র ১৩০ রান। অর্থাৎ ভারতের তখন প্রথম ইনিংসের বিনিময়ে ১৪৫ রান। ভারতের অমর সিংয়ের মত ইংল্যাণ্ডের ভেরিটিও সংগ্রহ করেন ৭টি উইকেট।

ফলো অনের সুযোগ থাকলেও ইংল্যাণ্ড অধিনায়ক জার্ডিন. ভারতকে ফলো-অনে পাঠাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের সূচনাও সুবিধের হয় নি। কেননা ১০২ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট ইংল্যাণ্ডকে হারাতে হয়। তারপর যখন ৭টি উইকেটে ২১৬ রান ওঠে তখনই ইংল্যাণ্ড ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ড দলের পক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করেন ওয়াল্টার্স।

জয়ের জন্য প্রয়োজন ৪৫২ রান। অথচ সমস্যা প্রচুর। নাওমাল অসুস্থ। মুস্তাক আলী ৮ এবং ওয়াজীর আলী ২১ রানে আউট। পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রকট। এই সময় মূল্যবান ৪৮ রান করে ভারতকে লড়াইয়ে ফিরে আসার আভাস দিলেন অমর সিং। তারপর পাতিয়ালার যুবরাজ যাদবেন্দ্র সিং এবং বিজয় মার্চেন্টের ভূমিকাও লড়তে পারার ইঙ্গিতকে আরো খানিকটা স্পষ্ট করে তুললো। কিন্তু সে ইঙ্গিতের ইতিও ঘটলো অচিরেই। ২৪৯ রানে শেষ হল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। ইংল্যাণ্ড জিতলো ২০২ রানে।

ভারতের মাটিতে প্রথম সফরে এসে তিনটি টেস্টের সিরিজে ২—০ ফলাফলে জেতার সুবাদে রাবারও রয়ে গেল ইংল্যাণ্ডের হাতে।

রাজপুরীর রহস্য

মহাশ্বেতা দেবী

[গোড়ার কথা :

এক হারিয়ে যাওয়া দেশের হারিয়ে যাওয়া রাজপুরী। গুপ্তধনের সন্ধানে অনেকে আসে, ফিরে যায় না। পাথরের সিংহ গর্জন করে। এক আদ্দি কালের বুড়োর মুখে কিছু গল্প শোনা যায়। একটা লোক এসেছে রাজপুরীতে যাবার পথ খুঁজতে। দেখা পেল এক সন্ন্যাসীর। সাড়ে তিনশো বছর আগেকার ঘটনার কথা সন্ন্যাসী বলে—মহাভারতের যুদ্ধের কথা সন্ন্যাসী বলে। এখানে নাম-না-জানা এক রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা।]

With best Compliments of :

M/s Hind Packaging Industries

ওর কোন শত্রু যেন চোখদুটো উপড়ে নিয়েছিল, অন্ধ হয়ে তবে ও আমাদের মধ্যে আসে।'

'সে তোমাদের কে?'

'দুঃখে কষ্টে ওই তো আমাদের ভরসা দেয়।'

'কী বলে?'

বুড়োরা চুপ ক'রে রইল। একজন আস্তে আস্তে বলল,—'বলে, অমন রাজাকে মেরে ফেললে দোষ নেই। রাজাকে মেরে, ছোট কুমারকে মেরে ধন-রত্ন লুটে নিতে বলে।'

শুনে সন্ন্যাসী কানে হাত দেন। বলেন,—'আমি আর শুনতে চাই না।'

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার আর মোটে দু'দিন বাকি। একদিন সন্ন্যাসীকে আর দেখা গেল না।

তিনি এলেন দু'দিন বাদে, যেদিন সিদ্ধশিবের মন্দিরের সামনে হাট বসবে। সবাই হাটে যাবে ব'লে তৈরী হয়েছে। এমন সময়ে সন্ন্যাসী এলেন। তাঁর চেহারা দেখে সবাই অবাক। কৌপীন কাদা-মাখা। জটাগুলি ভিজে। একহাতে একটি লোহার খন্তা। তিনি এসে সকলের মাঝখানে দাঁড়ালেন। বললেন 'তোমাদের আমি একটি কথা বলব।'

সবাই আগ্রহ ক'রে কাছে এল।

তিনি একটি পাথরের উপর দাঁড়ালেন। লোহার খন্তাটি ধ'রে একটু হেলে, একহাতে রোদ থেকে চোখ আড়াল ক'রে। লোকরা কলরব করতে থাকল। কেউ বলল,—'উনি আর নতুন কথা কী বলবেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা নিজেদের কাজে যেতে চাই।'

'ব্যাপারীরা এসে অন্যদের কাছ থেকে বেসাতি কিনে নিয়ে যাবে।'

'চাল, মধু, গমের খই, ঘোড়ার দানা, তীরের ফলা সব ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের।'

সকলের সব কোলাহল থামিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী যখন বলতে লাগলেন তখন কিন্তু আস্তে আস্তে সব কোলাহল থেমে গেল। তাঁর গলার স্বরটি মধুর, কথা বলবার ধরনটি বেশ শান্ত। আস্তে আস্তে, কথাগুলি শোনবার জন্যে সবাই কাছে ভিড় ক'রে এল।

'কী ক'রে তোমাদের এই দুঃখ কষ্ট দূর হ'তে পারে, একমাস ধ'রে আমি শুধু তাই ভেবেছি।'

'এই কথা বলবার জন্যে এত সোরগোল ক'রে ডাকা হ'ল নাকি?'—একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল। কিন্তু তার দিকে তাকালেন না সন্ন্যাসী। বললেন, —'একমাস গণনার পর এই কাল রাতে উপায় জানতে পারলাম। সোনা পেলে যদি দুঃখ কষ্ট দূর হয় তোমাদের, তবে দেব সোনার সন্ধান।'

'কৈ, কৈ সোনা?'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। আর তাদের সেই

অধীর আগ্রহ দেখে সন্ন্যাসীর মুখটা বেদনায় করুণ হ'য়ে গেল। আস্তে বললেন,—'তোমরা সবাই যাকে মানো, এমন একটি লোককে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তার কাছে আমি দিয়ে দেব সোনার সন্ধান। কিন্তু, তোমরা সকলে এক কথায় মেনে নাও যাকে, এমন কোন লোক কি সত্যিই আছে?'

'আছে।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল একটি বৃদ্ধ। চুল গুলো সত্যিই শণের নুড়ির মতো সাদা, নুয়ে পড়া শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল,—'ঠাকুর, তেমন লোক সত্যিই আছে।'

ভিড়ের দিকে চেয়ে বলল,—'আমি শঙ্করের কথা বলছি।' সন্ন্যাসীকে বলল,—'এই জঙ্গলের শেষে আমাদের রাজার রাজ্যের সীমা যেখানে, সেখানে সে থাকে।'

'অর্জুন গাছের তলায়?' সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে শুধোলেন।

'হ্যাঁ। তুমি সন্নেসী, সব জানতে পার। একটা মস্ত চ্যাটালো পাথরের ওপর থাকে সে। যেমন শরীরে শক্তি তার, তেমনিই বুদ্ধি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, চোখে যে দৃষ্টি নেই তার।'

সন্ন্যাসী একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'চল, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।'

'তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ। আমি তাকে দৃষ্টি দেব।'

'দৃষ্টি দেবে?'

'হয়তো গুরু দেবের তাই ই ইচ্ছা। নইলে এমন বিদ্যা আমাকে দিলেন কেন, যাতে আমি একটি, শুধু একটি লোককে আরাম করতে পারি? ভেবে ছিলাম এমন একটি লোককে খুঁজে বের করব, যে তোমাদের মঙ্গল চায়, এ-রাজ্যকে ভালবাসে। খোঁড়া হ'লে পা ফিরিয়ে দেব, কানা হ'লে চোখে দৃষ্টি এনে দেব। ভগবানের মনে হয়তো এই-ই ইচ্ছে ছিল।'

সন্ন্যাসীর কথাগুলো শুনে মনে হল, যেন তাঁর বড্ড কষ্ট হচ্ছে কথা কইতে। কথা শুনতে শুনতে মনে হ'ল যেন তিনি এদের মতো মানুষ নন্, কোন অন্য জগতের লোক। পাতলা শরীরটি শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা। সকালের আলোয় দেখা যায় দু'পাশে কানের চুলে পাক ধরেছে। চোখের পাতা, ভুরু সব যেন সাদাটে, যারা অনেকদিন আঁধার ঘরে থাকে, রোদে মোটে বেরোয় না, তাদের এমন দেখায় বটে।

অর্জুন গাছের নিচে একখানা চ্যাটালো পাথরে সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে শুকনো পাতায় মাথা রেখে পড়ে আছে এক প্রৌঢ়। বিশাল শরীর তার, দেখলে মনে হয় ঐ অর্জুন গাছের গুঁড়ির মতো শক্ত সমর্থ, একটু আগে বোধহয় খুব কেঁদেছে সে। এখনো গলার স্বর ভিজে, ভাঙা ভাঙা। সে বলছে,—'পনেরো বছর আগে রাজা বললে 'যাও, বড় কুমারকে মেরে এস। বিশ্বনাথকে আমি সহজে মারলাম, কিন্তু কুমারকে মারতে হাত উঠল না। অথচ, বিশ্বনাথ আমাকে হাতে ধ'রে বর্শা খেলতে শিখিয়েছিল।'

'তোমার কষ্ট হ'ল না?'

'না ঠাকুর, হাতে বর্শা বা তলোয়ার পড়লে আমার আর জ্ঞানগম্যি থাকত না। ঐ রকম কথায় কথায় মারতে পারতাম বলেই তো রাজা আমায় অমন দায়িত্বের কাজ রেখেছিলেন।'

'কী কাজ?'

'আমার একটি ছোট্ট দল ছিল। আমি ছিলাম রাজার ডানহাত। যাকেই দরকার হ'ত, লুকিয়ে নিকেশ করতাম। আড়ালে থেকে পাহারা দিতাম রাজাকে।'

'কেউ জানত না?'

'হয়তো দেওয়ানজী জানতেন। আর কেউ না। আমি তো লোকের চোখের সামনে কমই আসতাম। ঐ, বছরে একবার শুধু সিদ্ধশিবের মেলায় যেতাম। নিজেরও মেলা দেখা হ'ত, আর রাজকুমারদের পাহারা দিতাম।'

'শুনেছি যে রাজকুমারদের কোন রক্ষী থাকত না?'

'কে বললে? সদাসর্বদা নজরে থাকত তারা, জানতেও পারত না। নইলে আমারই বা চোখে পড়বে কেন যে বিশ্বনাথ বড়কুমারকে নিয়ে পালাচ্ছে?'

'এ-সব কথা আমায় ব'লনা।'

'না না, তোমায় এত কথা শুনতে বলি না, তুমি সন্নেসী মানুষ, রাজপুরীর এ সব কথা তোমার ভাল লাগবে না। সেখানে যে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, দিনরাত্তির পাহারা দিয়ে বাপ ছেলের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে…'

'ছোটবেলা এতকথা বোঝা যায় না তাই বোধহয় শৈশব এমন মধুর।'

'তা যা বলেছ ঠাকুর, এই দেখ না, রাজকুমাররা কি স্বপ্নেও জানতে পেরেছে যে কেমন ক'রে তাদের উপর নজর রাখতাম আমি?'

সন্ন্যাসী কথা কইলেন না।

প্রৌঢ়টি এবার তাঁর পা চেপে ধরে মুখটা তুলল মাটি থেকে। বলল,—'ঠাকুর, ঠাকুর তুমি যখন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে তখন আমি কি শুধু তুমি যা বলে দেবে সেই কাজটুকুই করব?'

'হ্যাঁ, শঙ্কর।'

'আমার নাম তুমি জান?'

'গাঁয়ের লোকেরাই বললে।'

'সত্যিই আমি আবার সব দেখতে পাব?'

'হ্যাঁ। দেখতে পাবে, আর আমি তোমায় বলে দেব সেই স্বর্ণভাণ্ডারের ঠিকানা।'

'বটে। রাজার যে অনেক ধন রত্ন আজও লুকোন আছে, সে তবে নেহাৎ শোনা কথা নয়?'

'না না, রাজাও বোধহয় সব জানেন না। এ তো তাঁর লুকোন সোনা নয়, এ যে মাটির বুক থেকে নদীর বয়ে আনা সোনা।'

'তুমি কেমন ক'রে জানলে?'

'গণনায় জায়গাটির খোঁজ পেয়েছিলাম, তারপর খন্তা নিয়ে খুঁড়ে নিজচোখে দেখে এলাম সব কথা সত্যি। মাটির বুকে কোথায় লুকোন ছিল সোনার রেণু, নর্মদার একটি শাখানদী……'

'জানি-জানি, এখন তো শুকিয়ে গিয়েছে।'

'ঠিক শুকিয়ে যায়নি, পথটি বদলে বেঁকে চলে গিয়েছে। তারই জলের সঙ্গে বয়ে এসে জমা হয়েছে সোনা।'

'কত সোনা? বল ঠাকুর বল, আজ আর আমার একটুও লোভ নেই মনে। একদিন অবশ্য সোনার লোভে সব কাজই করতে পারতাম।'

'সত্যিই তুমি বদলে গিয়েছ তো শঙ্কর?'

'সত্যি ঠাকুর, সত্যি সত্যি সত্যি, এই তিন-সত্যি করলাম। শুধু জানতে ইচ্ছে করে এত কি সোনা পাব যাতে এ দেশের লোকগুলোর সব অভাব ভুলিয়ে দেওয়া যায়?'

'পাবে শঙ্কর। এদের কথা তুমি ভাব বলেই তোমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাসের মর্যাদাটুকু রেখ। অন্যলোক আর কোথায় খুঁজে পাব? আমার এ ক্ষমতাটুকুও আজকের দিনের মধ্যেই কাজে লাগাতে হবে, এমন গুরুদেবের নির্দেশ।'

সন্ন্যাসী একটি নিশ্বাস ফেললেন। বললেন,—'একটি কথা তোমায় মনে রাখতে হবে। অতি গভীর খাদ, বড় দুর্গম জায়গা। আলগা পাথরে পা পড়লে কোথায় তলিয়ে যাবে আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া ····'

'কী, ঠাকুর?'

'দেখে এসেছি পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাতলা হয়েছে তার উপরে নদীর শুকনো খাতে জল এসেছে। পাথরের দেওয়াল যদি টলে যায় তবে সর্বনাশ হবে। একটি একটি ক'রে লোক নামবে, সন্তর্পণে খসিয়ে নেবে সোনার চাঙড়া। যদি কোলাহল ক'রে হাঙ্গামা বাধাও তাহলে রাজপুরী থেকে সৈন্যসামন্ত এসে পড়বে সেটাও মনে রেখ।'

'তা যা বলেছ।' প্রৌঢ়টির কপাল কুঁচকে গেল। সে বলল,—'ছোট কুমার সৌম্যই এখন সৈন্যসামন্ত চালায়। ওর মুখের কথার আগে হাতের তলোয়ারটা ছুটে যায় ওর।'

'তোমাদের ছোটকুমারের নাম সৌম্য?' সন্ন্যাসীর কণ্ঠ মৃদু।

'হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকুর, দেরী করছ কেন?'

'অধীর হয়োনা। আমি সময়ের অপেক্ষা করছি।' সন্ন্যাসীর গলা শুনে চমকে উঠল প্রৌঢ়টি। সন্ন্যাসী সূর্যের গতি দেখতে দেখতে বললেন,—'একটা কথা তো জিজ্ঞেস করলে না?'

'কী?'

'সোনার সন্ধান আমি জানি, তবু আমিই যাচ্ছিনা কেন ওদের নিয়ে?'

'ঠাকুর, এ যে ঘোরাল প্রশ্ন। সাধু-সন্নেসীর মতো কথা তো নয়?'

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন,—'মন্দ বলনি। আমি হাত দিলে হবে না, আরেকজনের হাত দিয়ে করাতে হবে কাজটি। এ-ও গুরুরই নির্দেশ। তোমায় আগে ভাগে বলে নিলাম, পাছে পরে মনে সন্দেহ আসে। কিন্তু আর কথা নয়। এস শঙ্কর, কাছে এস।'

লোকটি কাছে এল। উত্তেজনায়, বিস্ময়ে তার শরীর কাঁপছে।

সন্ন্যাসী তার মাথায় হাত রেখে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। বহুক্ষণ ধরে স্থির হয়ে রইলেন তিনি, পাতলা ও শুকনো ঠোঁট দুটি অল্প অল্প নড়তে লাগল, তারপর একসময়ে মন্ত্র পড়া হ'য়ে গেল। বুনোজন্তু যেমন শব্দ করে তেমনি আর্তনাদ ক'রে প্রৌঢ় বলল,—'ঠাকুর, আমার চাইতে ভয় করছে।'

'চাও, আমাকে দেখ।'

ভাল করে চাইল শঙ্কর। তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন কৃশদেহ তরুণ সন্ন্যাসী। পরনে কৌপীন তার ওপর জড়ানো কৃষ্ণসার হরিণের চামড়ার কটিবস্ত্র। রোদে পোড়া ফর্সা শরীরটির চামড়া এত পাতলা যে হাড় দেখা যায়। কোঁকড়া চুলে জটা পড়েছে, কানের পাশে চুল সাদা। চোখের চাহনি বড় আশ্চর্য, যেন ভেতর থেকে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে কেউ, অথচ দৃষ্টি দেখে মনে হয় কতদিনের দুঃখ, কত রাতের কান্না যেন জমে আছে ওখানে।

'যাও শঙ্কর, নিজের কাজে যাও। আমার কথা মনে রেখ, নইলে…'

'কী করবে ঠাকুর, দৃষ্টি কেড়ে নেবে?'

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন। বেদনার করুণ সে হাসি। বললেন,—'নইলে আমি যে দায়ী হব ভগবানের কাছে। অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে আমায়, যতদিন না এমন কেউ আসে যে এই সম্পদের যোগ্য অধিকারী। যেখানেই থাকি ঘুরে ঘুরে আসতে হবে। গুরুদেব আমায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন।'

শঙ্কর তাঁর পায়ের ওপর মাথাটি রাখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। একলাফে সে পাথর থেকে নামল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল,—'এই যে এইখানে আমার গুরু বিশ্বনাথকে মেরেছিলাম ঠাকুর, এইখানে দাঁড়িয়ে বিদায় দিয়েছিলাম বড়কুমারকে। সব মনে আছে আমার, সব দেখতে পাচ্ছি।'

হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে কথা কইতে কইতে সে লাফিয়ে নেমে গেল পাথরের গা দিয়ে। বলে গেল 'এইখানে বসে থেক ঠাকুর, কাজ হাসিল ক'রে তবে আসব তোমায় জানাতে।'

সন্ন্যাসী পাথরে বসলেন। অর্জুন গাছের গায়ে মাথা রেখে চোখ বুজলেন।

কিন্তু সন্ন্যাসী যা চেয়েছিলেন তা কি হ'ল?

অনেকক্ষণ বসে রইলেন তিনি। একসময়ে চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। পাথরটি দু'হাতে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। পশ্চিমে ডুবে গেছে সূর্য আকাশ এখনো লালচে আলোয় মাখামাখি তবু সেই সিঁদুরে লালের উপর একটি তারা ঝিকমিক করছে যেন কোন রানীর আঁচলে সোনার বুটি। যত আলো সব আকাশে, আর বনের উপর দিয়ে পৃথিবীতে ঘনিয়ে এসেছে আঁধার। আঁধার পাতলা হ'লে কি হয়, তবু দেখা যাচ্ছে দূরের গাঁয়ে আলো জ্বলে উঠছে।

কিন্তু উত্তর দিক থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে না? চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। একবার মনে হ'ল শীতের সময়ে ক্ষুধার্ত হায়েনাগুলো শিকারের পেছনে যেমন হাঁক্ হাঁক্ ডাকতে ডাকতে ধাওয়া করে এ চিৎকারও যেন তেমনি। তারপরই আর বুঝতে ভুল হ'ল না। দেখতে পেলেন জ্বলন্ত মশালের নাচানাচি, বিপন্ন নরনারীর চিৎকার। দেখতে পেলেন যেদিকে রাজপুরী সেদিকের আকাশে রাঙা আগুনের হল্‌কা। আকাশের রাঙা মিলিয়ে যেতে থাকল নিবিড় কালোয় আর কালো পাথরের রাজপুরীর ওপরের আকাশটা রাঙা হ'তে থাকল আগুনের আভায়।

সন্ন্যাসীর বুকটা যেন চিরে গেল। 'ভগবান!' ভয়ার্ত আর্তনাদ করে তিনি ছুটে চললেন সামনের দিকে।

নদীর সে মরা খাতের খাদের কিনারায় সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। যারা খাদে নেমেছিল তারা লোভে অধীর হয়ে নিজেদের মধ্যেই হানাহানি করে।

তারা উঠতে না উঠতে ওপর থেকে আরো মানুষ নামতে চেষ্ট করে।

'তারপর ?' সন্ন্যাসী চেঁচিয়ে ওঠেন,—'শঙ্কর কোথায় ? সে ছিল না !'

'শঙ্কর ?' গাঁয়ের বৃদ্ধটি কপালে করাঘাত করল। বলল,—'যখন এখানে হানাহানি চলছে তখন রাজপুরী থেকে এল সৈন্যরা। কোনদিকে না তাকিয়ে চালাতে লাগল বর্শা।'

'তোমরা কী করছিলে ?'

'হা ভগবান্। আমাদের ছেলেরাও বের করলে তীর ধনুক। এদিকে হানাহানি করতে সবাই যখন ব্যস্ত তখন কোথা দিয়ে যে পাথরের দেওয়াল ভেঙে জলের স্রোত নামল তা কে দেখল ?'

'বলেছিলাম, শঙ্করকে বলেছিলাম !'

'তখন শঙ্কর আমাদের ছেলেদের আর যারা ছিল তাদের নিয়ে একজন সৈন্যের ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরীতে ধাওয়া করলে তলোয়ার হাতে।'

'সে কি !'

'রাজাকে মেরে ও শোধ নিয়েছে, তারপর কি কি হয়েছে তাও কি বলে দিতে হবে ঠাকুর ! দেখতে পাচ্ছনা আগুন ? শুনতে পাচ্ছনা গোলমাল ? লোভে অধীর হয়ে সবাই যে এখন রাজার প্রাসাদে লুট করতে ছুটেছে।'

'তাই বুঝি ?·····ও কি ?'

সভয়ে চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। ডাকছে, আবার ডাকছে সিংহ। রাজ প্রাসাদের দিক থেকে ভেসে আসছে গভীর সিংহ গর্জন। নিয়তির ইচ্ছেয় আজ আবার এক সর্বনাশের সন্ধ্যা এসেছে, তাই ডাকছে পাথরের সিংহ। সন্ন্যাসী শুনতে লাগলেন সিংহ গর্জন কেমন ক'রে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে দৈবকে অতিক্রম করতে চাইলে কি হয়। এ রাজ্যের মঙ্গল চেয়েছিলেন না তিনি ? সিংহ গর্জনে-গর্জনে জানিয়ে দিচ্ছে তা হয় না, নিয়তিকে জয় করা যায় না।

বৃদ্ধের হাত দুটি জড়িয়ে ধরলেন সন্ন্যাসী। কাতর অনুনয়ে বললেন,—'ক্ষমা করো আমায়। বিশ্বাস কর এ আমি চাইনি। আমি প্রাণ থেকে তোমাদের মঙ্গল চেয়েছিলাম।'

তারপর ছুটে চলে গেলেন সামনের দিকে। তাঁর দিকে চেয়ে বৃদ্ধটি অবাক হয়ে একবার শুধু বললে, —'ও যে প্রাসাদে সোজা যাবার লুকোন পাকদণ্ডীর রাস্তা রে, সন্নেসী কেমন ক'রে জানলে ?'

রাজপ্রাসাদে সন্ন্যাসী ঢুকলেন একা। দেউড়ীর ফটক খোলা, উঠোনে দগ্ধ মশাল পড়ে পড়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। মানুষ নেই, জন নেই, দরজার পর দরজা খোলা, শুধু মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে আংটায় আটকানো মশালগুলো জ্বলছে। চওড়া এ-বারান্দা দেখে মনেও হয় না এখানে একদিন তিলক উৎসব উপলক্ষে কত আলোর মালা সাজানো হয়েছিল, শানাই-এর বাজনা এই বারান্দার খিলানে গম্বুজে কেমন সুন্দর প্রতিধ্বনি তুলেছিল। সন্ন্যাসী এলেন পূজোর ঘরে। নিবু নিবু পিদীমের আলোয় দেব মূর্তির পাথরের চোখ ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে

সামনের দিকে যেখানে পাঁজরে বর্শা নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন রাজা। ঘন রক্ত শ্বেতপাথরের বেদীর সামনে চাপ বেঁধে কালো হয়ে আছে।

মাথা নেড়ে অস্ফুটে কী বললেন সন্ন্যাসী, তারপর চলতে লাগলেন তাড়াতাড়ি। দরজার পরে দরজা খোলা, কোথায় যেন পিঁজরায় পাখী ভয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে, কারা যেন ত্রস্তে ছুটে চলে গেল এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। ঈষৎ নিচু একটি মস্ত লম্বা ঘর দিয়ে ভেতরে চলে এলেন সন্ন্যাসী, যে ঘরটিতে ঢুকলেন সেটি নীরব নিশ্চুপ। একদিন এ ঘরে বসে দুটি ভাই পিদীমের আলোয় যেন কার গল্প শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়ত, কে যেন মায়ের স্নেহে এ ঘরটিকে সব হানাহানী হিংসে বিদ্বেষ থেকে আড়াল করে রাখত! দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী, আজো কি সব তেমনি আছে? না ওখানেও সব উলটে পালটে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে? শুনতে পেলেন অস্ফুট কান্না, বিলাপের স্বর—'আমাকে একবারটি যেতে দে, দেখতে দে তাকে, সৌম্য। আমাকে ও নিজে মুখে বলুক এতদিন বাদে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল।'

প্রতিশোধ নিতে এসেছিল? সন্ন্যাসী কপালটি পাথরের দেওয়ালে ঠেকিয়ে যেন কাসের তাপ জুড়োতে চাইলেন।

'কারো কথা আমি বিশ্বাস করি না সৌম্য, একবারটি তার কাছে যেতে দে আমায়, আমি তাকে দেখি।'

'না।'

সন্ন্যাসী দরজায় দু'পাশে দু'হাত রেখে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে হাত থেকে তলোয়ার পড়ে পড়ে গেল মাটিতে, বর্শা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সৌম্য—'কে? কী চাও তুমি?'

'কুশল!'

রানীমা-র চিৎকার হাত দিয়ে চাপা দিল সৌম্য, টেনে নিয়ে চলল তাঁকে ভেতরের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে ডানহাতে সজোরে ছুঁড়ে মারল সোনার চাবি—'এই নাও, সব নাও।'

সন্ন্যাসীর কপালে এসে লাগল চাবি। মাটিতে পড়ল। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন রক্ত। হাত চেপে সরে এলেন পেছনে। কানে বাজতে লাগল আর্ত কান্না—'ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমাকে।'

মুখ ফিরিয়ে চলে এলেন সন্ন্যাসী, নিঃশব্দে ছুটে চললেন গলি দিয়ে। গলির পর গলি, তারপর ঘর। সরু সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন পেছনে, পুরানো মহলের দেউড়ীর কাছে। তারপর আর কিছু নেই। শুধু সেই গুহা, শুধু এক পাথরের সিংহ। তারপর থমকে দাঁড়ালেন। লাঠি ঠুকঠুক করে এগিয়ে এল এক বৃদ্ধা। আস্তে হাতটি রাখল সন্ন্যাসীর বুকে। বলল,—'গঙ্গার সাথে একটা কথাও না বলে চলে যাচ্ছিস কুশল!'

'কুশল! এ নামে আজ কেন ডাকলি গঙ্গা? এ নাম যে পনেরো বছর আগে ফেলে গেছি রাজপ্রাসাদে, যেদিন মাঝরাতে দেওয়ান এসে একটা দশ বছরের ছেলেকে ডেকে নিয়েছিল? এ নাম যে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম নর্মদার জলে। যেদিন জেনেছিলাম যে যে-বাপকে দেখলে ছেলের বুক দশ হাত হ'ত, সে-ই ছেলেকে মারতে লোক পাঠাতে পারে, যে মা-কে ছাড়া আর কিছু জানিনি, সেই মা-ও আপন নয়, এ কথা যেদিন জানি সেদিনই যে এ-নাম ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম নর্মদার জলে।'

'তবে আজ তোর গলার স্বরে এত ব্যথা কেন রে কুশল? মায়া-মমতা এখনো লেগে আছে? আচ্ছা, সন্ন্যাসী তুই হ'তে পারিসনি!'

জবাব দিলেন না সন্ন্যাসী। অবসন্ন শরীরটা আজ কেবলই ঢলে পড়তে চাইছে। কিন্তু আর এখানে নয়।

'আর না গঙ্গা, এবার আমি যাই।'

'যাবি? তুই যাবি কুশল?' দু'হাত সন্ন্যাসীর মুখে মাথায় বুলোতে বুলোতে গঙ্গা কাঁপাকাঁপা গলায় বললে—'তপস্যার সবটুকু ফল দিয়ে শঙ্করের দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিয়ে যদি আমার চোখ দুটো ফিরিয়ে দিতিস কুশল, তবে আমি আর কিছু চাইতাম না। শুধু তোকে দেখতাম দু'চোখ ভরে।'

'এই ভাল গঙ্গা, এই ভাল হ'ল।'

'যদি আর একটু থাকতিস্ রে কুশল.....'

'না গঙ্গা। আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম সব যদি বা পালটে যায় তবু মায়ের স্নেহ, ভায়ের ভালবাসা সব এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে কি না!'

গঙ্গা ফিসফিস ক'রে বললে—'ওদের দোষ নেই, ওরা ভয় পেয়েছে।'

'শুধু তুই একরকম আছিস গঙ্গা'...গঙ্গাকে একবার জাপটে ধ'রে তারপর চলে গেলেন সন্ন্যাসী সুড়ঙ্গের দিকে। এই পথ দিয়ে পনেরো বছর আগে একরাতে.....

'কুশল, ওপথে যাস্ না।'

সিঁড়ির পর সিঁড়ি, কী রকম শক্তি হারিয়ে ফেলছেন আজ, নামতে পারবেন তো! শরীর থেকে যেন জীবনী শক্তি চলে যাচ্ছে—কপাল থেকে রক্ত পড়ছে বলে?

'কুশল, আমার কথা শোন্। ও পথ কবে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, সিঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন রাজামশায়।'

গঙ্গার কথা কিছুতে শুনবেন না সন্ন্যাসী। এই সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেই নিশ্চয় পথ পাওয়া যাবে।

'কুশল, রাজকোষের সব ধনরত্ন ওখানে রেখে....রোস।'

গঙ্গার কথা যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। একটু কানে আসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এতক্ষণ ধরে নামছেন, সিঁড়ি শেষ হতে চায়না কেন?

'...কেউ যাতে সন্ধান না পায় তাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যাবার পথ দিলেন বন্ধ করে।....কুশল!'

গঙ্গার শেষ কথাটা হারিয়ে গেল হাহাকারে। সে কান্না বুঝি গুহার বুকে গমগম করে উঠল এমন ক'রে যে অস্ফুট আর্তনাদ, পড়ে যাবার শব্দ, কিছুই শোনা গেল না। শুধু ক্ষীণ শোনা গেল একটা মর্মর, যেন পাথর ওপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ছে একটার পর একটা।

'তারপর ?'

'আর কিছু নেই।'

'তবে এ শুধু মিছে কথা নয় ? সত্যিই আজও লুকোন আছে ধনরত্ন সেই সুড়ঙ্গে ?'

সন্ন্যাসী নিরুত্তর।

'বলুন ?'

লোকটি হঠাৎ জোরে, চেঁচিয়ে বলল কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল ধুনীর নিবন্ত আগুন বড় বেশী হেঁয়ালি রচনা করছে। কোথায় গেল গুহার গায়ে সেই বড় বড় ছবি ; তীর ধনুক লোহার ঘণ্টা, এ কি ?

ঝটপট ঝটপট শব্দ। চামচিকে আর বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে। ভেতরে ঢুকল কখন ?

'তুমি মিথ্যাকথা বলেছিলে।'

চমকে উঠল লোকটি। হাঁটুর উপর চিবুক রেখে সন্ন্যাসী তার দিকে চেয়ে আছেন।

'কে, কে বলেছে ?'

'এ বংশের কেউ বেঁচে নেই। যদি কোনদিন এমন কেউ আসে···কিন্তু তুমি এত করলে কেন ? লোভ ? গুপ্তধনের সন্ধান চেয়েছিলে ? বল !'

সন্ন্যাসীর কণ্ঠ গমগম ক'রে উঠল।

'আমি ··আমি চলে যেতে চাই.....

'চলে যেতে চাও ! সকলেই চলে যেতে চায়··· তোমার আগে একজন সাহেব এসেছিল সে-ও চলে যেতে চেয়েছিল....তার আগে একজন।'

গুহার মুখ লতাপাতায় ঢেকে যাচ্ছে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা শেকড় নেমে আসছে ধীরে ধীরে। লাফিয়ে উঠে পড়ল লোকটি। দেখতে পেয়েছে সে, কানের পাশে সাদা চুল, শীর্ণ শরীর, সন্ন্যাসী মাথাটা পেছনে হেলিয়ে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন !

আর্তনাদ করে বেরিয়ে এল লোকটি, সিংহ-স্তম্ভের পাথরটা ধরে হাঁপাতে থাকল, অন্ধকার, অন্ধকার সব। শুধু তারার আলোয় অন্ধকারটা স্বচ্ছ মনে হয়।

সেই স্বচ্ছ অন্ধকারে, তার চোখের সামনে স্তম্ভ থেকে ক্রুদ্ধ সিংহ ঘাড় নামাল। তার চোখে চোখে রেখে গর্জন করে উঠল হাঁ ক'রে।

সকাল বেলা গ্রামের লোকরা তার মৃতদেহ পেল গুহার মুখে। আশ্চর্য, মৃতদেহে কোথাও আঘাতের চিহ্নমাত্র ছিল না, বিস্ফারিত প্রাণহীন দুই চোখে শুধু ছিল ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

সে-দুর্গপ্রাসাদ আর বিস্মৃত সে-রত্নভাণ্ডারের সন্ধান নিতে আর কেউ কোনদিন যায়নি সেখানে।

———

শুধু ডেয়ার ডেভিল ডানপিটেদের জন্যে !

বোতল লিপিকার বিচিত্র কাহিনী

অদ্রীশ বর্ধন

ছিপি-আঁটা বোতলে-ভরা চিঠিও চর্কিপাক দিয়ে আসতে পারে পৃথিবীটাকে !

বোতল ! সামান্য একটা কাঁচের বোতল !

ঘরে ঘরে এমনি খালি বোতল কতই না গড়াগড়ি যায়। যতক্ষণ বোতলে কিছু থাকে, ততক্ষণই তার কদর। খালি হয়ে গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দিই বাজে জিনিসের স্তূপে। তখন তা জঞ্জাল ছাড়া কিছুই নয়। হয় শিশি বোতলওলা কিনে নিয়ে যাচ্ছে নামমাত্র মূল্যে, নয়তো হামানদিস্তায় গুঁড়িয়ে কাঁচগুড়ো বানানো হচ্ছে মাঞ্জাটানার জন্যে। হে বোতল ! তোমার অপার মহিমার কোনো বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই বলেই এত হেনস্থা করি তোমাকে। তুমি বার্তাবহ, তুমি অমর। অম্লান ! আমরা অজ্ঞ ! ক্ষমিও মোদের ! বোতল-বন্দনা দিয়েই শুরু করা যাক দুর্দিনের বন্ধু বোতলের গৌরবগাথা।

১৯৫৮ সালের শরৎকালে পাওলিনা নামে একটি মেয়ে বউ হয়ে গিয়েছিল আকে ভাইকিং নামে একটি বরের। কিভাবে হয়েছিল ? কার কৃপায় হয়েছিল ? না, না, কোনো ঘটকের দৌলতে নয়। তুচ্ছ একটি বোতল, সামান্য একটা ফেলে দেওয়া বোতল ঘটকগিরি করে দিয়েছিল দুজনের। অবশ্য বহুদূর পর্যটন করতে হয়েছিল বোতল বাবাজীকে। বহু দিবস অতিবাহিত হয়েছিল, অথই জলে ভাসতে ভাসতে ঝাড়া দু-টি বছর বোতল ঘটকের। এক পয়সাও ঘটক বিদায় দিতে হয়নি। দু-বছর পরে বোতল তার কাজ শেষ করেছে—বিয়ে হয়ে গেছে পাওলিনা আর আকে ভাইকিংয়ের।

অথচ পাওলিনা হল সিসিলির ধীবরকন্যা। আর আকে ভাইকিং হ'ল সুইজারল্যাণ্ডের তরুণ নাবিক। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একটানা উত্তাল সমুদ্রে জাহাজে

বসে বিরক্ত ধরে গিয়েছিল আকে ভাইকিংয়ের। একদিন কি খেয়াল হয়েছিল। একখানা চিঠি লিখে খালি বোতল কুড়িয়ে নিয়ে তার ভেতরে পুরে ছিপি এঁটে ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রে। সেই বোতল ভেসে এল সিসিলিতে। পাওলিনার ধীবর পিতা মাছ ধরছিল জলে। বোতলটা পেয়ে মেয়েকে ক্ষেপানোর জন্যে দিল পাওলিনাকে। কেননা, তার মধ্যে চিঠিখানা ছিল বড় মজার। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় তিতিবিরক্ত হয়ে আকে ভাইকিং লিখেছিল—এই চিঠি যদি কোনো সুন্দরী কন্যার হাতে পড়ে এবং যে যদি এক সুন্দর বর চায়, ঝটপট যেন চিঠির জবাব দেয়!

পাওলিনা চিঠি পড়েতো হেসে কুটিপাটি। বড় মজার ছেলে তো আকে ভাইকিং! আর মহা কিপ্‌টেও বটে! চিঠি ছেড়েছে বাজে বোতলের মধ্যে এক পয়সাও খরচ হয়নি। ডাকটিকিট পর্যন্ত লাগেনি। বিশ্বস্ত বোতল কিন্তু নিখরচায় চিঠি ঠিক পৌঁছে দিয়েছে এক সুন্দরীর হাতে। আমাদের দেশের পিওন যেন এই কাহিনী পড়ে শিক্ষা পায়। তারা তো ডাকটিকিট আঁটা চিঠিও ছুঁড়ে ফেলে দেয় পুকুরে পাছে বোঝা হইতে হয়—এই ভয়ে।

পাওলিনার রূপ ছিল। বড় দুষ্টুও ছিল। আকে ভাইকিংয়ের পেছনে লাগার এই সুযোগ ছাড়ল না। পালটা চিঠি লিখল তাকে। সেই চিঠি পেয়ে হবু-বর পরম কৌতুকে জবাবও দিল। চলল চিঠি চালাচালি। তারপর একদিন সিসিলিতে এল আকে। দেখা হল দুজনে। পত্রমিতালীর শেষটা হল বিয়ের মধ্যে দিয়ে। বিয়ের ভোজ খেয়ে দু-হাতে পেটে চেপে বেদম হাসতে হাসতে অতিথিরা বিদেয় হল অবশেষে।

আর সেই বোতলটা? দীর্ঘ দু-বছর পর যার দৌলতে এই বিয়ে হল, তার কি অবস্থা হল? আবার গড়াগড়ি খেতে লাগল জঞ্জালের গাদায়—কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাল না। খেতেও ডাকল না!

বোতলের তাতে দুঃখ নেই। এমনিভাবেই আরও অনেক বোতল যুগ যুগ ধরে অসহায় মানুষদের কত উপকারই করে চলেছে—প্রয়োজন ফুরোলেই বোতলগুলোর কথাও আর কেউ ভাবছে না। বোতলরা কিন্তু তা সত্ত্বেও ছিল, আছ, থাকবে!

হারিকেন ঝড়ে বোতল

বোতল! হে বোতল! তুমি অতি ভঙ্গুর! দুম করে মারলেই ঠুন্ করে ভেঙে যাও। তবুও সমুদ্র পথে তোমার মত টেঁকসই পথিক এই দুনিয়ায় আর দুটি নেই। অবশ্য যদি তোমার মুখে ছিপিটি ভালভাবে আঁটা থাকে। ভয়াবহ যে হারিকেন ঝড়ে বিরাট জাহাজও ডুবে যায়, সে ঝড়ও তোমায় কাবু করতে পারে না। ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে লাফাতে লাফাতে কলা দেখাও তুমি ঝড়ের মাতনকে। আছড়ে তোমাকে ভাঙা যায় ঠিকই, সমুদ্রে কিন্তু তোমার পরমায়ু অনন্তকাল। ১৯৫৪ সালে ১৮টা বোতল উদ্ধার করা হয়েছিল একটা ডোবা জাহাজের পেট থেকে। ২৫০ বছর আগে জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল কেন্ট উপকূলে। তোমাদের ভেতরে ছিল সুরা—২৫০ বছর জলে ডুবে থাকায় সুরাকে সুরা বলে আর চেনা যায়নি। কিন্তু তোমাদের চেনা গিয়েছিল। নতুনের মতই অবিকৃত ছিলে তোমরা। তোমাদের নমস্কার!

তোমরা কিন্তু বড় খামখেয়ালী? সমুদ্রে ভেসে পড়লে তোমাদের আর দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না। আপন খেয়ালে ভেসে চলো যেদিকে খুশী।

জ্যোতিষীরও সাধ্য নেই বলে কোন্ দিক যাবে শেষ পর্যন্ত। ব্রেজিলের উপকূলে একই সঙ্গে দুটো বোতল জলে ফেলা হয়েছিল। একটা ভেসে গিয়েছিল পূর্বদিকে—১৩০ দিন পরে পৌঁছেছিল আফ্রিকার বালুকাবেলায়। আর একটা গিয়েছিল সটান উত্তর দিকে—১৯০ দিন পরে পৌঁছেছিল নিকারাগুয়ায়। কোটি প্রণাম জানাই তোমাদের। মতিগতি তোমাদের বোঝা ভার!

খেয়ালী হও আর যাই হও, নিজেদের স্পীড বলে তোমাদের কিস্সু নেই। এই একটি ব্যাপারে তোমাদের খেয়ালখুশীমত ভাসিয়ে নিয়ে যায় বাতাস আর স্রোত। বাতাস জোরে বইলে, স্রোতের টান থাকলে তরতর করে ভেসে যাও, নইলে নয়। বাতাস আর স্রোত যদি না থাকে, এক্কেবারে স্থির হয়ে ভেসে থাকতে হবে তোমাদের। আবার যদি গালফ্ স্ট্রীমে গিয়ে পড়ো তাহলে ঘণ্টায় চার 'নট' পর্যন্ত স্পীডে ছুটতে হবে তোমাদের—এক-একদিনে ১৯০ মাইল পাড়ি দেওয়া তখন তো ছেলেখেলা। নয় কী?

দীর্ঘতম সমুদ্রযাত্রা

সমুদ্রে তোমাদের পরমায়ু অনন্ত। কাজেই লম্বাপথ পাড়ি দেওয়া তোমাদের কাছে কিছুই নয়। কোনো মেহনত তো নেই—শুধু মজাসে ভেসে থাকা। সবচেয়ে লম্বা সমুদ্রযাত্রার যে রেকর্ড যে বোতলটি সৃষ্টি করেছে, তার নাম কিন্তু 'ফ্লাইং ডাচম্যান'। ১৯২৯ সালে বোতলটা দক্ষিণভারত মহাসাগরে নিক্ষেপ করেছিল জার্মান বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীরা। ভেতরে ছিল এমন একটি বার্তা যা বোতল না ভেঙেই পড়া যায়। তাতে লেখা ছিল শুধু একটাই কথা—এ বোতল যার হাতে পড়বে, সে যেন তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয় বোতলটা পাওয়া গেছে কোথায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার ফেলে দেয় সমুদ্রে। নিশ্চয় পূর্বদিকে-বওয়া স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল 'ফ্লাইংডাচম্যান'। তাই পৌঁছে গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার ডগায়। সেখানকার মানুষ বোতল পেয়েই ভেতরকার নির্দেশমত খবরটা জানিয়ে দিয়ে ফের ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রে। এইভাবে বেশ কয়েকবার তোলা আর ফেলার পর 'ফ্লাইং ডাচম্যান' শেষকালে পৌঁছেছিল আটলান্টিক মহাসাগরে—, সেখান থেকে আবার ভারত মহাসাগরে। যেখানে প্রথম নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, গিয়েছিল প্রায় সেই জায়গা দিয়েই এবং ১৯৩৫ সালে তাকে তুলে নেওয়া হয় অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে। হে বোতল, জানি বুক ফুলে উঠছে তোমার দোস্তের কীর্তি শুনে। কিন্তু আমরা হতবাক হয়েছি। সামান্য একখানা বোতল বৈ তো নয় 'ফ্লাইং ডাচম্যান'। তার পক্ষে ২৪৪৭ দিনে ১৬,০০০ মাইল অক্ষত অবস্থায় সমুদ্রে টোঁ টোঁ করাটা কি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়? গড়ে দিনে প্রায় ৬ নটিক্যাল মাইল পাড়ি দিয়েছে তোমার দোস্ত। তুমি তো জানোই এক নটিক্যাল মাইল ডাঙার হিসেবে ১৮৫২ মিটারে সমান।

বোতল থেকে সমুদ্রপথ সংকলন

কত উপকারই যে তোমরা করেছো সমুদ্রের ডানপিটেদের নীরবে নিঃশব্দে—অনেকেই তা জানে না। দিগন্তজোড়া ধূ ধূ সমুদ্র পথের চার্ট রচনা পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে তোমাদের মহিমায়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাম একটা বাচ্চা ছেলেও আজ জানে, তোমরা তো জানবেই। উনি যখন নর্থ আমেরিকান কলোনীতে পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছিলেন, তখনি একটা ব্যাপার দেখে

ওঁর খটকা লাগে। তিমি শিকারের জাহাজের ক্যাপ্টেনরা সমুদ্র স্রোতের খবর রাখে বেশী। তাই আমেরিকান জাহাজ আটলান্টিককে যত তাড়াতাড়ি পেরোতে পারে, তেমনটা পারে না ব্রিটিশ ডাকবাহী জাহাজগুলো, তাই তিনি সমুদ্র পথের একটা চার্ট সংকলন করলেন তিমি শিকারীদের যাত্রাপথ আর বোতল বাবাজীদের বিবাগী পথ ধরে। গালফ স্ট্রীমে খান কয়েক বোতল তিনি ভাসিয়ে দিয়ে ভেতরে চিঠিতে লিখেছেন—যে এইসব বোতল পাবে, সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। অভিনব এই প্রক্রিয়ায় যে তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, আজও তা কাজে লাগছে সমুদ্রের ডানপিটেদের।

সেই থেকে আমেরিকান আর ব্রিটিশ নৌবিভাগ ব্যাপকভাগে বোতলদের শরণ নিয়েছে জটিল সমুদ্রপথের সংকলনে। সমুদ্রে ভাসমান বোতলের কৃপায় খনি, মাছের ঝাঁক, এমন কি সমুদ্রের ওপর ভেসে থাকা পাতলা তেলের আস্তরণের সন্ধানও পাওয়া গেছে। হে বোতলেশ্বর, খুরে খুরে প্রণাম তোমার অদ্ভুত সৃষ্টিদের!

অদ্ভুত এই বোতলরা কিন্তু অনেক সময়ে অনেক অদ্ভুত বার্তাও বয়ে নিয়ে গেছে পেটের মধ্যে। রাণী প্রথম এলিজাবেথের হাতে এই ভাবে একটা গোয়েন্দা-সংবাদ এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু গুপ্ত খবর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল বোতলটা একজন মাঝির হাতে পড়ায় সে খুলে ফেলেছিল বলে। রাণীতো রেগে কাঁই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আইন করে দিলেন, সরকারী বোতল খুলিয়ে ছাড়া সমুদ্রে ভাসমান বার্তাবহ বোতল যে খুলবে, তার মুণ্ডু যাবে। প্রাণের মায়া বড় মায়া, কেউ আর সেই থেকে নাকি বার্তা-বহ বোতলদের ছিপি খুলে কৌতূহল চরিতার্থ করতে যায়নি। হে বোতল এরজন্যে নিশ্চয় তোমাদের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল? রাণীর সুনজরে তোমরা পড়েছিলে বলে কতজনকে কুনজরে পড়তে হয়েছে, সে হিসেব কিন্তু আজও পাওয়া যায়নি। আছে, আছে, আরো জবর খবর আছে। ১৮৭৫ সালে যে বছরে সিপাই বিদ্রোহ হয় ভারতবর্ষে, ঠিক সেই বছরেই কানাডিয়ান জাহাজ 'লেন্নি'র নাবিকরা বিদ্রোহ করে বসেছিল। ভাঁড়ার রক্ষককে তারা প্রাণে মারেনি সে জাহাজ চালাতে জানত'বলে। জাহাজ সে চালিয়েছিল ঠিকই, তবে ফরাসী উপকূলে নিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের বলে ছিল স্পেনে এসেছি। আসার পথে অনেকগুলো বোতল সবার অগোচরে জলে ফেলেছিল—প্রত্যেকটা বোতলেন মধ্যে ছিল বিদ্রোহ সংবাদ। এই রকম একটা বোতল পড়েছিল ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে। তাঁরা আর দেরী করলেন না। জাহাজে উঠে এলেন এবং হতবাক বিদ্রোহীদের হাতে শেকল পরালেন। বেচারীরা বাধা দেওয়ারও সময় পায়নি। বোতল! তোমরা না থাকলে প্রই অসম্ভব কাণ্ড কি সেদিন সম্ভব হত?

টর্পেডোয় জখম রণতরী

যুক্তরাষ্ট্রের মেইন সৈকতে ১৯৪৪ সালে একটা বার্তা-বহ বোতল পাওয়া গিয়েছিল: 'আমাদের জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে। এই আমাদের শেষ। জরুরী বার্তা পাঠিয়েও কোনো লাভ হল না। হয়ত এক দিন এই বার্তা গিয়ে পৌঁছোবে যুক্তরাষ্ট্রে।'

টনক নড়ল যুক্তরাষ্ট্রের। অনেক খোঁজখবর নিয়ে জানাগেল তলিয়ে যাওয়া জাহাজটার নাম ইউ-এস-এস 'বিয়েট্রি'। চমৎকার রণতরী। কিন্তু টর্পেডোয় জখম হয়ে গিয়েছিল জিব্রাল্টারে ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর—অনেক প্রাণনাশ ঘটেছিল সেদিন!

একবছর পরে অনুগত বোতল কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রীদের হাহাকার পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল তাদেরই দেশের মাটিতে! কাকতলীয় বলা যায়, তাই না?

এর চাইতেই চমকপ্রদ কীর্তিকাহিনী জানা গেছে। দুজন অস্ট্রেলিয়ান সৈনিকপুরুষ ফ্রান্সে যাচ্ছিল জাহাজে চেপে। জলে ফেলে গেছিল একটা বার্তাবহ বোতল। কত বছর বাদে বোতলটা মানুষের হাতে পড়েছিল, জানো কি হে বোতল-নন্দন? ঠিক ৩৭ বছর পরে! পাওয়া গেছিল তাসমানিয়ায় ১৯৫৩ সালে!

করুণ কাহিনীও আছে বৈকি। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়েছিল এক সৈনিকপুরুষ। বোতলের মধ্যে তার হাতে লেখা চিঠি ভেসে এসে ছিল তারই মায়ের কাছে—হাতের লেখা দেখেই চিনে ছিলেন মা!

সবচাইতে অদ্ভুত খবরটা এবার বলা যাক। মাৎসুয়ামা নামে এক জাপানী নাবিক ৪৪ জন সঙ্গীসহ জাহাজডুবি হয়ে ১৭৮৪ সালে ঠাঁই নেয় প্রশান্তের এক প্রবাল দ্বীপে। সেখানে স্রেফ না না খেয়ে যখন মরতে বসেছে সবাই, তখন মাৎসুয়ামা একটা কাঠের টুকরোর ওপর নিজেদের শোচনীয় কাহিনী খোদাই করে লিখে বোতলে পুরে ভাসিয়ে দিয়েছিল সমুদ্রে।

দীর্ঘ ১৫০ বছর পরে ১৯৩৫ সালে বোতলটা ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এসে পৌঁছেছিল সমুদ্রের ধারের ঠিক সেই গ্রামটিতেই যে গ্রামে জন্ম হয়েছিল মাৎসুয়ানার। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটা কিন্তু সত্যি! হে বোতল জানি না তোমরা অলৌকিক শক্তিধর কিনা। কিন্তু তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে তো মনে হয় তোমরা অনেক অজ্ঞাত শক্তির অধিকারী!

এবার একটা বিচিত্র সংবাদ দিয়ে বোতল-উপাখ্যান শেষ করা যাক। সবাই জানে অ্যাডলফ হিটলার বার্লিনের বাঙ্কারে মারা গিয়েছিলেন! কিন্তু সত্যিই কি তাই? ড্যানিশ উপকূলে একটা বার্তাবহ বোতল পাওয়া গিয়েছিল ১৯৪৬ সালের ২৬ শে নভেম্বর। বার্তাটা লেখা হয়েছে জার্মান ইউ-বোট নওসিলাস-য়ের লগ-বুকের ছেঁড়া পাতায়। তাতে বলা হয়েছে ফিনল্যাণ্ড থেকে ফ্রাঙ্কোর স্পেনে যাওয়ার পথে ধাক্কা লেগে ডুবে যাচ্ছে 'নওসিলাস' ইউ-বোট এবং হিটলার মারা গেছেন এই ইউ-বোটেই।

হয়তো পুরো ব্যাপারটাই একটা ঠাট্টা!

বোতল, হে বোতল, তাতে কিন্তু তোমাদের মহিমা খর্ব হয়নি। অক্ষয় হও, অমর হও বলে তোমাদের আর অপমান করবো না—শুধু বলব, তোমাদের কৃপাদৃষ্টি থেকে মানুষ যেন কখনো বঞ্চিত না হয়!

[পরে পাবেন

ঝিনুক নৌকোর নায়ক

নিছক একটা অনুমিতি প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেই নিজের নৌকাডুবি ঘটিয়ে বসেছিলেন এক ফরাসী ডাক্তার।]

———

ছায়া মূর্তি

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

একটা আলোর ঝলক ঠিকরে এসে পড়ল ব্রীজের বাইরে। দাঁড়িয়ে আছে চীফ অফিসার, থার্ড এঞ্জিনিয়ার আর একজন ওয়াচম্যান। এদের তিন জনেরই চোখ মুখ ঝলসে গেল যেন।

কোনদিক দিয়ে আলোটা এসেছে, খোঁজ করে হদিশ মিললো না। জাহাজের একদম ওপর তলায় ব্রীজ ঘর। অফিসার ব্রীজঘরের জানলা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে।

চীফ অফিসার কেমন হয়ে গেছে যেন। শশব্যস্ত হয়ে আমার কেবিনের দরজায় ছুটে এসেছে। ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে আমায়। হাত ঘড়িতে রাত তিনটে।

দরজা খুলেই ওর চোখমুখের অবস্থা দেখে আমি চমকে গেছি। দিনের অফিসার নয় বুঝি। এ এক অন্য মানুষ। রাজ্যের ভয় এসে জেঁকে বসেছে এর সর্ব শরীরে। তাকিয়ে আছি মুখের দিকে। একটাই কাতর অনুনয় শুনছি কেবল। —তুমি রেডিওরুমে একবার আসতে পারবে? ভয়ে নিজের মাতৃভাষায় বলছে এবার, 'প্যারো-ক্যালো ত্ব ম্যারকোই', দয়া করে একবার এসো।

গ্রীক জাহাজের গ্রীক অফিসারের কথায় আমি জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। যাচ্ছি রেডিওরুমে দিকে। জিজ্ঞেস করছি, এত রাত্তিরে রেডিওরুম কেন?

কোন উত্তর নেই। মুখখানা লাল হ'য়ে উঠছে স্রেফ। চুপ ক'রে গেলুম আমি। ওকে আর অস্বস্তিতে ফেলার দরকার নেই। চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন এখুনি তো হ'য়ে যাবে সব।

তিনচারজন ছাড়া সারা জাহাজটা গভীর ঘুমে অচেতন। চতুর্দিকে মিশমিশে কালো। গভীর কালো জলে ভাসছে জাহাজ। আমরা দু'জনে অন্ধকারের বুকে টর্চের আলোয় পা ফেলে ফেলে চলেছি।

থম থমে ভাবটা রেডিওরুমের সামনে এসে দাঁড়াতে বেশী করে অনুভব করলুম। ওয়াচম্যান আর থার্ড এঞ্জিনীয়ারের অবস্থা শোচনীয়। ভয়ে কাঠ একেবারে। তবে এখানে আমি আসতে মনে হ'ল, অফিসার একটু ভরসা পেয়েছে। মুখ খোলায় বোঝা গেল।

বলল, আলোর ঝলকের কথা। আসাও যেমন

তীব্রবেগে, অদৃশ্যও তেমনি চোখের পলকে। পলকে হ'লে কি হবে, জ্বালা এখনো যায় নি সম্পূর্ণ। রেশ রয়েই গেছে। জেনারেটর লাইটের তারে আলোর দাপাদাপি দেখেছে অনেক। এমন ভয় ধরেনি কোথাও।

বলেছে, তুমি রেডিওরুমটা ভালো ক'রে দ্যাখো দিকিনি। কোন গণ্ডগোল-টণ্ডগোল হয়েছে কিনা।

আলো জ্বেলে ভেতরে ঢুকেছি আমি।

সমস্ত জিনিস যন্ত্রপাতি তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলুম। না, কোন জায়গায় কোন চিহ্নই খুঁজে পেলুম না আলোর ঝলকের কারণ।

নিজের কেবিনে ফিরে আসার সময় সাহস দিয়ে বললুম, আবার যদি ওরকম দ্যাখো কেবিনের অ্যালার্মবেল অন করবে।

ফিরে এসে ডায়রীর পাতা ওলটাচ্ছি। এ ঘটনাটাও লিখতে হবে। যদিও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, তবুও সমুদ্রবুকের নিঃসঙ্গের মনগড়া সঙ্গীর ছবি তো ফুটে রয়েছে এতে।

দশই অক্টোবর' ৮১।

রাত তিনটে....।

হাতের কলম হাতেই আটকে রইল। সরল না আর, অ্যালার্মবেল বেজে উঠেছে কেবিনে। বাইরে সেলার ডাকছে। একটুও দেরী না ক'রে, এক্ষুনি যেতে হবে ওপরের ব্রীজে।

ঘড়ির দিকে চোখ ফেরালুম।

রাত চারটে।

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে এলুম ওপরে।

এবারে জাহাজ জেগে উঠেছে ডাকাডাকি হাঁকা হাঁকিতে। সকলের মুখে ত্রাসের ছায়া। একটা কিছু বড় রকমের বিপদ ঘটে গেছে যেন। আশঙ্কা যায়নি। আবারো ঘটবে বুঝি আরো ভয়ঙ্কর ভয়াবহ।

পরিবেশটা এমন বিচ্ছিরি রকমের যে, যে-কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষও নিজের মনোবল হারাতে বাধ্য। সাহস হারাতে বাধ্য।

সারবেঁধে দাঁড়িয়ে বারান্দায় অফিসার, সেকেণ্ড এঞ্জিনীয়ার, থার্ড এঞ্জিনীয়ার, সেলার, ক্যাপটেন। সকলেরই মুখ গম্ভীর। এক ক্যাপ্টেনের ছাড়া। ক্যাপ্টেনের মুখে ব্যঙ্গের হাসি।

আমি যেতে অফিসার বলেছে, ব্রীজের বাইরে দাঁড়িয়ে থার্ড এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে গল্প করতে করতে আবার সেই আলোর ঝলক দেখতে পেয়েছি আমরা। ক্যাপ্টেন গুরুত্ব দিচ্ছে না। ও কিছু নয় বলে

কথা শুনে জোরে হেসে উঠেছে ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সমস্ত আলো নিভে গেছে। ব্রীজের ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনছি আমি।

ওরা সকলে কান খাড়া করে রয়েছে। এবারে আর ক্যাপ্টেনের মুখে হাসি নেই। মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন।

অটোপাইলটের কাছ থেকে কান্না ভেসে ভেসে আসছে। আমি আরো এগোচ্ছি। বাইরে থেকে চিৎকার ক'রে ডাকছে সকলে, 'মার্কনি'—এরা রেডিও অফিসারকে মার্কনি বলে—বেরিয়ে এসো শীগগির! তোমায় মেরে ফেলবে, মেরে ফেলবে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি দাদুর হাসি মুখ। সজল! সেই কণ্ঠস্বর হুবহু দাদুর। কান্না থেমে গেল মুহূর্তে। আপনা হতে জ্বলে উঠেছে জাহাজের সমস্ত আলো।

(শেষাংশ ১৪২ পৃষ্ঠায়)

·····গোগোলের সঙ্গে বুনো হাতি·····

সমরেশ বসু

মাত্র দু বছর আগের কথা। গোগোলের বাবা-মা ঠিক করে ফেললেন, সামারের ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়া হবে; ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু, টানা দার্জিলিং যাওয়ার বদলে, শিলিগুড়িতে তিন-চারদিন থাকবার কথা হল। শিলিগুড়িতে গোগোলের ন-মামা থাকেন। সেখানে ন-মামীমা আছেন, আর দাদা-দিদিরাও আছে। ন-মামা অনেকবারই যেতে বলেছেন। কখনো যাওয়া হয়নি। এবারে সেটা ঠিক করা হল।

সামারের ছুটিতে দার্জিলিং মেলে জায়গা পাওয়া আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া প্রায় এক কথা। বাবার কাজ অনেক। বেশিদিন অপেক্ষা করারও উপায় নাই। তাই প্লেনে বাগডোগরা যাওয়া ঠিক হল। সেখান থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর গাড়িতে শিলিগুড়ি সিটি অফিসে পৌঁছুতে পারলে, ন-মামার কলেজপাড়ার বাড়িতে রিকশায় যেতে দশ মিনিটের ব্যাপার।

প্লেনের টিকেট আর আসন পাওয়া গেল তিন দিনের মধ্যেই। গোগোলের এটাই প্লেনে প্রথম চড়া নয়। আগেও প্লেনে চড়ে গৌহাটি গিয়ে, সেখান থেকে গাড়িতে শিলং গিয়েছে। অতএব প্রথম প্লেনে চড়ার উত্তেজনা ছিল না।

ফকার ফ্রেণ্ডশিপ প্লেনে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই দমদম থেকে বাগডোগরা। ন-মামাকে চিঠি লিখে খবর দেওয়া ছিল। কলকাতার বাড়ি থেকে সকালবেলা বেরিয়ে দুপুরের খাবার আগেই গোগোল বাবা-মায়ের সঙ্গে ন-মামার বাড়ি পৌঁছে গেল। বড় ছোট সকলের মধ্যেই একটা আনন্দের হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সেই দিনটা খেয়ে-দেয়ে, মহানন্দা নদীর সেতুর ধারে বেড়িয়েই কাটল। সন্ধেবেলা বাবার সঙ্গে কথা বলে, ন-মামা জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারির কেয়ারটেকার অফিসারকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, ঘর পাওয়া যাবে কি-না। প্রথমে জানা গেল, এত তাড়াতাড়ির নোটিসে ঘর পাওয়া সম্ভব নয়। তার-পরে ভদ্রলোকের কী মর্জি হল, তিনি একটি ঘর এক রাত্রির জন্য দিতে পারবেন বলে জানালেন।

জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে চেপে, জঙ্গল ঘুরে, গণ্ডার, হরিণ, এমন কী বাঘের দেখাও নাকি পাওয়া যেতে পারে! গোগোল ব্যাপারটা ভেবে এতই

উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, রাত্রে তার চোখে ঘুমই আসতে চাইল না। যদি বা ঘুম এল, সারারাত্রি প্রায় হাতির পিঠে চাপার স্বপ্ন দেখেই কেটে গেল। আর কত গণ্ডার-হরিণ যে দেখল, তার কোনো হিসাবই নেই।

বাবা যে শিলিগুড়িতে ন-মামার বাড়িতে কয়েকটা দিনকাটিয়ে, দার্জিলিং যাবার কথা ভেবেছিলেন, তার আসল কারণ জলদাপাড়ায় যাওয়া। পরের দিন সকালে বাবা-মা'র সঙ্গে গোগোল, বুড়োদা, আর মিনুদিও চলল। ন-মামা আর মামীমা গেলেন না। তবে ন-মামা গোগোলদের জলদাপাড়ার বাসে তুলে দিয়ে গেলেন।

যথেষ্ট সকালে বেরোলেও, দুপুর হয়ে গেল জলদাপাড়ায় পৌঁছুতে। কিছু খাবার আর জল সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। জলদাপাড়ায় পৌঁছুতেই সব সাবাড়। আসবার পথে অনেক চা-বাগান চোখে পড়ল। বাঁদিকে ভূটানের পাহাড় আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু জলদাপাড়ায় পৌঁছে, গোগোলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল আশেপাশে ঘন বন-জঙ্গল দেখতে পাবে। তার বদলে চারদিকে মিলিটারি ক্যাম্প। ঘন ঘন ট্রাক আর জীপের যাতায়াত। কয়েক সেকেণ্ড অন্তর-অন্তর কেবলই বন্দুকের গুলির আওয়াজ। আর মাথার ওপর দিয়ে প্রায় অনবরতই উড়ে চলেছে হেলিকপটার নয়তো ছোট ছোট এরোপ্লেন। বুড়োদা আগেও জলদাপাড়ায় এসেছে। সে বলল, "গুলির আওয়াজ হচ্ছে চাঁদমারিতে, সেখানে রাইফেলধারী সৈন্যরা তাদের হাতের টিপ করে। আর কাছেই হাঁসিমারা বলে একটা জায়গায় এয়ার-ফোর্সের এয়ারবেস রয়েছে। হেলিকপটার আর প্লেনগুলো সেখান থেকেই উড়ছে।"

গোগোলরা ফরেস্টের অফিস থেকে যখন বাংলোয় গেল, তখনও মিলিটারি দোতালা কোয়ার্টার্সের সারির পাশ দিয়েই যেতে হল। তার মানে, জলদাপাড়া এখন একটা পুরোপুরি সামরিক আর বিমান ঘাঁটি। তাই দেখেই গোগোলের যা আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দও নষ্ট হয়ে যেতে বসল, যখন শোনা গেল, এখন বাংলোতে খাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। পথ চলার জন্য খাবার কিছু সঙ্গে নেওয়া যায়। তা বলে দুপুরের খাবার কেউ বয়ে বেড়ায় না।

শেষ পর্যন্ত বাবা বাংলোর কেয়ারটেকারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করালেন। তাঁর হাতে টাকা দিয়ে বললেন, "এ বেলাটা কোনো রকমে ডাল-ভাত করে চালিয়ে দাও। ও-বেলা মাংস মাছ মুরগি যা জোগাড় করতে পারবে, তাই খাওয়া যাবে।"

বাংলোর দোতলায় একটা বড় ঘরই গোগোলদের দেওয়া হল। দুটো খাট ছিল। কেয়ারটেকার জানিয়ে দিলেন, রাত্রে আরো কিছু বিছানা আর একটা মশারি দিতে পারবেন। মাথার ওপরে পাখা আছে। গরমের একটা রাত কোনো রকমে কেটে যাবে।.

রাতটা কেটে গেল ঠিকই। ভোরের অন্ধকার থাকতেই কেয়ারটেকার গোগোলদের দরজায় ঠকঠক করে ঘুম ভাঙিয়ে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেলেন। জানিয়ে গেলেন, "হাতি তৈরী। যত ভোরের দিকে রওনা হওয়া যাবে, ততই ভাল।"

এ খবর শোনার পরে আর চা-বিস্কুটে কারোরই মনোযোগ থাকতে পারে না। অন্তত গোগোলের তো না-ই। পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ল। বাংলোর পিছনেই দুটো হাতি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের পিঠে মাহুত। তাছাড়াও দু-জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। মাহুত কী বলল, কী করল, কে জানে, হাতি দুটো বসে পড়ল। আর বাকি লোক দুটো, হাতির গায়ে মই লাগিয়ে দিয়ে গোগোলদের উঠতে সাহায্য করল। চটের গদি মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাহুত বলে দিল,

সবাই যেন শক্ত হাতে দড়ি ধরে রাখে।

বাবা-মা উঠলেন একটা হাতির পিঠে। বুড়োদা আর মিনুদির সঙ্গে গোগোল আর একটা হাতির পিঠে। হাতি যখন উঠে দাঁড়াল, গোগোলের মনে হল, একটা পাহাড় যেন ওকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে চলল। ভীষণ মজায় ওর হাসি পেতে লাগল, আবার ভয়ও করতে লাগল। হাতির পিঠে দোলা খেয়ে ওরা সবাই হাসছিল। বাবা-মাও হাসছিলেন। তার মধ্যেই বাবা চিৎকার করে সাবধান করে দিলেন "সবাই শক্ত করে হাওদার দড়ি ধরে থেকো।"

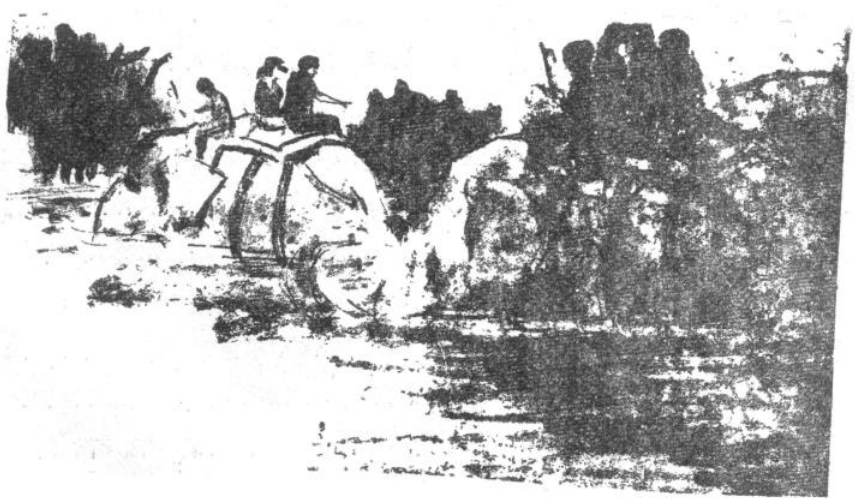

গোগোল খুশি হল, এদিকে মিলিটারি ক্যাম্প নেই। গাছপালায় পাখিরা ডাকছে। এখনো সূর্য ওঠেনি। তারপরে হাতি দুটো যখন একটা নদীতে নামল, তখন গোগোলের মনে আনন্দ আর ভয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। ও জিজ্ঞেস করল, "বুড়োদা, এটা কী নদী?"

বুড়োদা বলল, "এটা জলঢাকা নদী। নদীর ওপারে তাকিয়ে ছাখ, ওটাই আসলে জলদাপাড়া ফরেস্ট।"

গোগোল বিশাল চওড়া নদীর ওপারে তাকিয়ে দেখল, নিবিড় সবুজ বন। আর হাতি দুটো কখনো জলের ওপর দিয়ে কখনো পাথর-ছড়ানো চরের ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে-ফেলে চলল। এক সময়ে গভীর জলের মধ্যে, হাতি দুটো সাঁতার কেটে পার হতে লাগল। গোগোলদের পায়ে জল লেগে গেল। ভয় পেয়ে ও জিজ্ঞেস করল, "বুড়োদা, হাতি জলে ডুবে যাবে না তো?"

বুড়োদা বলল, "দূর বোকা, হাতি আবার জলে ডোবে নাকি। মনে কর, আমরা এখন নৌকোয় করে নদী পার হচ্ছি।"

গভীর জলে হাতির পিঠে, ব্যাপারটা প্রায় সেই রকমই। ঠিক যেন একটা নৌকো দুলে দুলে, জল কেটে চলেছে, আর স্রোতের সঙ্গে লড়ছে, যাতে টানে ভেসে না যায়। এ পর্যন্ত খুবই ভাল কাটল। কিন্তু গোগোলদের কপাল খারাপ। নদী পার হয়ে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেকটা বেলা অবধি ঘুরেও কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখা গেল না। গণ্ডার হরিণ আর বাঘ তো দূরের কথা একটা খরগোশও চোখে পড়ল না। ইতিমধ্যে চাঁদমারির গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে আরম্ভ করেছে। আকাশে হেলিকপটার উড়তে দেখা যাচ্ছে।

মাহুত বলল, "জলদাপাড়ায় এখন আর গণ্ডার হরিণ বিশেষ দেখা যায় না। গুলির আওয়াজে আর হাওয়াই জাহাজের ভয়ে ওরা সব হলং-এর জঙ্গলে চলে গেছে। সেখানে এখন অনেক বড় ফরেস্ট বাংলো হয়েছে। আজকাল সবাই ওখানেই যায়।"

গোগোল মন খারাপ করে বাংলোয় ফিরে এসে বাবাকে হলং-এর বাংলোর কথা বলল। বাবা বললেন, "হলং-এর বাংলো পেতে দেরি হয়। তাছাড়া, নিজেদের গাড়ি না থাকলে হলং-এ যাওয়ারও অনেক অসুবিধে।"

বাবার কথা শুনে গোগোলের মনটা আরও হতাশায় ভরে গেল। বাবা কেবল বললেন, "দেখা যাক কী করা যায়।"

তারপরে করার আর কিছুই ছিল না। সেই দিনই শিলিগুড়িতে ফিরে, রাতটা ন-মামার বাড়িতে কাটল। পরের দিন ভোরবেলা জীপে চেপে দার্জিলিং। এ যাত্রায় বুড়োদা আর মিনুদি ছিল না। দু দিন দার্জিলিং-এ কাটিয়ে, সেখান থেকে কার্শিয়ং-এ গিয়ে তিব্বতী লামাদের বৌদ্ধ মঠে গোগোল তো এক কাণ্ডই করে বসল। যাই হোক, সে-সব কাণ্ড-কারখানার কথা এখন আর বলে দরকার নেই।

কার্শিয়ং থেকে ফিরে আবার দার্জিলিং। ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়িয়ে, গোগোল জলদাপাড়ার দুঃখটা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু বাবার মতলব ছিল আলাদা। তিনি দার্জিলিং-এর ট্যুরিস্ট অফিস থেকে, হলং-এর বাংলোর দুটো ঘর দু-দিনের জন্য বুক করে ফেললেন। বাবা খবর নিয়ে জেনেছিলেন, দার্জিলিং থেকে হলং-এর বাংলো বুক করার সুবিধে। বাবা গোগোলের কাঁধে হাত চেপে বললেন, "এবার হল তো?"

গোগোল খুশি হয়ে বাবাকে একটা চুমু দিয়ে দিল। তবু জিজ্ঞেস না করে পারল না, "কিন্তু বাবা, হলং-এ যাবার গাড়ির কী হবে?"

বাবা বললেন, "কী আর হবে? শিলিগুড়ি থেকে দু-দিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।"

তাই করা হল। সেইদিনই গোগোলরা দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি ন-মামার বাড়ি ফিরে এল। ন-মামা সব শুনে, সন্ধেবেলাতেই একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেললেন। পরের দিন, ভোরবেলা হলং যাত্রা। গাড়ি ভোরবেলাই এসে গেল। ড্রাইভার লোকটি বাঙালী আর বেশ ভদ্রলোক। এ যাত্রায় আবার বুড়োদা আর মিনুদি সঙ্গে।

গাড়ি প্রথমে চলল জলদাপাড়ার পথেই। তারপরে এক সময়ে আসাম যাবার রাস্তায় ঘুরে গেল। সেই পথেই পড়ল হলং-এর জঙ্গলে ঢোকবার গেট। রীতিমতো তালা-চাবি লাগানো লেবেল ক্রসিং-এর মতো লোহার ডাণ্ডার গেট। গেটম্যান বাবার কাছ থেকে বুকিং স্লিপ দেখে, তালা খুলে দিল।

দু পাশে ঘন বন। মাঝখান দিয়ে শক্ত লাল মাটি আর কাঁকরের রাস্তা। কিন্তু গাড়ি বনের মধ্য দিয়ে চলেছে তো চলেছেই, থামবার আর নাম নেই। গোগোল বলে উঠল, "বাংলোটা কত দূরে?"

ড্রাইভার হেসে বলল, "গেট থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার।"

বুড়োদা হলং-এ কখনো আসেনি, তাই বলতে পারল না। গোগোল এবার বুঝল, কেন গাড়ি ছাড়া হলং-এ আসা যায় না। গাড়ি না থাকলে এতটা পথ হেঁটে যেতে হত। বাসে এলে, বাসও মাঝপথে বদলাতে হত। অনেক ঝামেলা। কিন্তু গভীর বনের ভিতর দিয়ে গাড়িতে যেতে গোগোলের দারুণ

মজা লাগছে। এখানে মিলিটারি ক্যাম্প নেই, চাঁদমারির গুলির আর হেলিকপটারের আওয়াজ নেই। কেবল বন আর বন। তারপরই হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা কাঠের চওড়া সাঁকো, ওপারে কাঠের সুন্দর দোতলা বাংলো।

বাংলোর চত্বরে গাড়ি দাঁড়াতেই, গোগোল দরজা খুলে নেমে পড়ল। প্রথমে বাংলোটা দেখল। জলদাপাড়ার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। বিরাট ডাইনিং রুম, বসবার ঘর আলাদা। সোফা সেট দিয়ে সাজানো। ড্রাইভার বলল, "সাঁকোর নীচে যে নদীটা আছে, সেখানে অনেক মাছ দেখা যায়।"

গোগোল অমনি বুড়োদা আর মিনুদির সঙ্গে সাঁকোর ওপর ছুটে গেল। দেখল নীচে কাঁচের মতো জলে অনেক আর বড়-বড় মাছ খেলা করছে। গোগোল হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। মাছগুলোর একটু ভয় নেই।

মাছ দেখে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে কিছুটা হেঁটে যেতেই বাঁ দিকে দেখা গেল কয়েকটা হাতি বাঁধা রয়েছে। তার মধ্যে একটা হাতি, একটু দূরে তার চারপাশে গোল করে লোহার বড়-বড় ছুঁচলো গজাল পোঁতা। কেন? গোগোল বুড়োদাকে জিজ্ঞেস করল। বুড়োদা কিছুই বলতে পারল না। হাতি গুলো লম্বা ঘাস আর গাছের ডালপাতা খাচ্ছে।

কাছেই কতকগুলো কাঠের উঁচু ঘর। অন্য পাশে কাঠের একটা বাংলো-বাড়ি। রেলিঙে জামা-কাপড় শুকোচ্ছে। লোকজন বিশেষ দেখা যায় না। বোধহয় মাহুতদের পরিবারের মেয়ে-বউরাই কেউ-কেউ ঘর-কন্নার কাজ করছিল এই সময়ে মিনুদি বলে উঠল, "ওখানে ওট্টা কী ছাখ।"

গোগোল ঘরগুলো ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে দেখতে পেল, একটা বাচ্চা হাতির গলায় শেকল বাঁধা। সেও লম্বা-লম্বা ঘাস খাচ্ছে। গোগোল তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটে গেল। বুড়োদা মিনুদিও গেল। বাচ্চা হাতিটা ফোঁস ফোঁস করে ওদের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিল। বুড়োদা বলল, "দেখিস গোগোল, কাছে যাসনে।"

গোগোল তবু একটা হোগলার মতো লম্বা ঘাস বাচ্চা হাতিটার দিকে বাড়িয়ে দিল। বাচ্চা হাতিটা ঘাসের ডগাটা শুঁড়ে জড়িয়ে টান দিতেই, গোগোল তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বুড়োদা ধরে ফেলল। গোগোল বেশ একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে, আর অবাক হয়ে বলল, "আরে বাস্‌রে, বাচ্চাটার গায়ে কী জোর।"

ঠিক এই সময়েই পিছন থেকে মোটা আর গম্ভীর গলা শোনা গেল, "তোমরা কোথা থেকে এসেছ ভাই?"

সবাই পিছন ফিরে দেখল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক। ডাক্তারি পড়ে গোগোলের তিতুদা, অনেকটা তার মতোই দেখতে। বুড়োদাই সকলের বড়, ক্লাস এইটে পড়ে। সে বলল, আমরা শিলি-গুড়ি থেকে এসেছি।"

মিনুদি তাড়াতাড়ি গোগোলকে দেখিয়ে বলল, "ও কলকাতা থেকে এসেছে।" তিতুদার মতো লোকটি যার তিতুদার মতোই গোঁফ আছে আর হাওয়াই শার্টের সঙ্গে সাদা ট্রাউজার পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, গোগোলের দিকে একবার দেখলেন। মুখ তুলে চার পাশে একবার দেখে নিয়ে বললেন, "তোমরা ছেলেমানুষ, এভাবে এখানে ঘুরো না। কয়েকদিন হল, একটা দাঁতাল বুনো হাতি খুব উৎপাত করছে।"

গোগোলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "উৎপাত করছে? কেন?"

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "বুনো হাতিটা একটু রেগে আছে।"

বুড়োদা বলে উঠল, "তার মানে পাগলা হাতি?"

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই, পিছন থেকে বাবার ব্যস্ত আর উৎকণ্ঠিত ডাক শোনা গেল, "গোগোল, বুড়ো, মিনু, তোমরা শিগ্‌গির বাংলোয় ফিরে এসো।"

সকলেই পিছন ফিরে তাকাল। দেখা গেল, বাবা ড্রাইভারের সঙ্গে প্রায় ছুটে আসছেন।

কাছে এসে বাবা বললেন, "তাড়াতাড়ি বাংলোয় চলো সবাই। এখানে একটা বিরাট বুনো দাঁতাল খ্যাপা হাতি আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকজনকে তাড়া করছে।" বলে সবাইকে তাড়া করে নিতে গিয়ে বাবা সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি এই ফরেস্টেরই একজন রেঞ্জার। আমিও এদের বুনো হাতির কথাই বলছিলাম। তবে এত তাড়াহুড়ো করে ছোটবার কিছু নেই। বুনো হাতিটা লোকজনকে এমনিতে বিশেষ কিছু করছে না। চলুন, আপনাদের সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।"

সকলের চোখে-মুখেই কেমন একটা ভয় নেমে এসেছিল ভদ্রলোকের কথায় আবার যেন সাহস ফিরে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক যেতে যেতে বললেন, "হাতিটা পুরুষ, আর বিরাট দেখতে, দাঁত দুটোও প্রকাণ্ড। মনে হয়, আসাম থেকে ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছে।"

ভদ্রলোককে গোগোলের এতই ভাল লেগে গেল, তাঁর কথাবার্তা বলার ধরনও এত সুন্দর, ও সবাইকে ঠেলেঠুলে, তাঁর গা ঘেঁসে চলছিল। বলে উঠল "আচ্ছা দাদা—"

এইটুকু বলেই গোগোল থমকে গেল। কোনো ভদ্রলোককে এ রকম "দাদা" বলে ডাকা বাবা মোটেই পছন্দ করেন না। লজ্জা পেয়ে ও বাবার দিকে তাকাল। ভদ্রলোক সেটা বুঝে, হেসে বললেন "আমার নাম জয়ন্ত। তুমি আমাকে জয়ন্তদা বলতে পারো।"

বাবা গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গোগোল মনে-মনে ভরসা পেল। জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা জয়ন্তদা আপনি কী করে জানলেন, বুনো হাতিটা ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছে?"

জয়ন্তদা বললেন, "আমরা তো এইসব নিয়েই থাকি। সাধারণত এই সব অঞ্চলে ভুটানের পাহাড় থেকেই হাতিরা জঙ্গলে নেমে আসে। তবে জঙ্গলে নেমে আসার সময় হল বর্ষাকাল।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "বর্ষাকালে কেন?"

জয়ন্তদা বললেন, "বর্ষাকালে পাহাড়ের আর আসামের নদীগুলোতে বন্যা হয়। হাতিরা বন্যাকে বেশ ভয় পায়। তাছাড়া এদিকে তখন খেতে প্রচুর ফসল থাকে, হাতিরা সেই ফসল খেতে আসে। খায়, নষ্ট করে। তখন খবর পেয়ে আমরাই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে ওদের গিয়ে তাড়াই।"

এই কথা বলতে বলতে সাঁকো পেরিয়ে গোগোলরা সবাই বাংলোর চত্বরে এসে পড়ল। গোগোল দেখল, মা ভয়-ব্যস্ত চোখে ওদেরই দেখছেন। বসবার ঘরের জানালা দিয়ে। সবাইকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন।

জয়ন্তদা বলে উঠলেন, "ওই ছাখো, শ্রীমান নদীর ওপারের মাঠে দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে দেখছে।'

নদী মানে, সাঁকোর নীচে দিয়ে যে ছোট জলের ধারা বয়ে গিয়েছে, বাংলোর সামনে দিয়েই তার স্রোত চলেছে। সেখানে একটা বাঁধানো ঘাট। ঘাটের

ওপারে বেশ খানিকটা খোলা সবুজ মাঠ। সেই মাঠেই বিরাট বুনো হাতিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোগোল ওর জীবনে এত বড় হাতি আগে কখনো দেখেনি! এত বড় দাঁতও কোনো-হাতির চোখে পড়েনি। হাতিটার নীলচে কালো গায়ের কোথাও কোথাও কাদা-মাটির দাগ। কান দুটো পিছন দিকে যেন টেনে রেখেছে, আর আস্তে শুঁড় দোলাচ্ছে। গোগোল ভয় পাওয়ার থেকে মুগ্ধই হয়ে গেল বেশি। হাতিটাকে ঠিক যেন বনের রাজার মতো দেখাচ্ছে। গম্ভীর আর শান্ত। পাগলামি খ্যাপামির কোনো চিহ্নই নেই। গোগোলের ইচ্ছে হল, ছুটে হাতিটার কাছে চলে যায়। গেলে কী হবে? হাতিটা ওকে মেরে ফেলবে? কথাটা ভেবেও জয়ন্তদাকে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

কয়েক মিনিট পরেই হাতিটা আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

জয়ন্তদা বললেন, "সবাই ঘরের মধ্যে চলো। ও হয়তো এখানেই আসবে।"

সবাই হুড়মুড় করে দৌড় দিতেই জয়ন্তদা বললেন, "এত তড়োহুড়োর কিছু নেই। নদীটা পেরিয়ে ও বড়জোর ঘাটের সামনেই আসবে। বাংলোর চার পাশে এই যে দেখছ পাথরকুচি ছড়ানো, এর ওপরে হাতি কখনো পা দেবে না। পায়ের নখের ফাঁকে নরম জায়গায় বিঁধে যাবার ভয় আছে। আসলে হাতি খুবই বুদ্ধিমান জীব।"

বুড়োদা বাংলোর ভিতরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, "কিন্তু বুনো যে?"

জয়ন্তদা বললেন, "বুনো হাতিরও যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। চলো, দেখি গিয়ে বসবার ঘরের জানালা দিয়ে ও এল নাকি।"

সবাই বসবার ঘরের জানালাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল। আর সকলেই অবাক হয়ে দেখল, সত্যি বুনো হাতিটা এইটুকু সময়ের মধ্যেই নদী পেরিয়ে ঘাটের ওপর বাংলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পাথর-কুচি ছড়ানো চত্বরে পা দিচ্ছে না।

গোগোলের শরীরে রীতিমতো খুশির শিহরণ হইতে লাগল। এত কাছ থেকে, এমন বিরাট বুনো দাঁতাল হাতি কোনদিন দেখবে, ভাবতেই পারেনি। রোদ লেগে ওর দাঁত দুটো ঝকমক করছে। আর বাংলোর দিকে শুঁড় বাড়িয়ে যেন গোগোলদেরই গন্ধ শুঁকছে। গোগোলের মনে হল, কেবল রাজা নয়, ওকে যেন বইয়ে পড়া স্বর্গের ঐরাবতের মতো মহান দেখাচ্ছে।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে, ও বাঁ দিকে ফিরে আস্তে আস্তে চলে গেল। বাবা-মা'ও হাতিটাকে দেখছিলেন। এই সময়ে রসুইখানার পাচক এসে মাকে ডেকে নিয়ে গেল। গোগোল জয়ন্তদাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি যে বলছিলেন, ও উৎপাত করছে, রেগে আছে? শুধু-শুধু কেন কেন এরকম করছে?"

জয়ন্তদা হেসে, একটা সোফায় বসে বললেন, "তোমরা সবাই বোসো, আমি ব্যাপারটা বলছি।"

গোগোল আগেই জয়ন্তদার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। বাবাও মুখ টিপে হেসে একটা সোফায় বসে গেলেন। জয়ন্তদা বললেন, "তোমরা আমাদের পোষা হাতি-গুলো দেখেছ?"

সবাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানাল, দেখেছে। জয়ন্তদা বললেন, "তার মধ্যে একটা হাতিকে লোহার ছুঁচলো গজাল পুঁতে ঘিরে বেঁধে রাখা হয়েছে, দেখেছ?"

"দেখেছি।" সবাই বলল।

জয়ন্তদা হাত তুলে বললেন, "বেশ। ওটি হল মেয়ে

হাতি, ওর নাম বনমালা। এখন এই বুনো হাতিটা চায়, বনমালাকে সে বিয়ে করবে। বনমালাও হাব-ভাবে তাই চাইছে।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "হাতির বিয়ে! কী করে করবে?"

জয়ন্তদা বললেন, "ওদের অবিশ্যি পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়তে হয় না। দুজনে এক সঙ্গে মিশে, বনে চলে গেলেই ওদের বিয়ে হয়ে যায়।"

গোগোল বলল, "তবে বিয়ে হচ্ছে না কেন?"

জয়ন্তদা বললেন, "কী করে হবে বলো। তা হলে তো আমাদের বনমালাকে ওর সঙ্গে ছেড়ে দিতে হয়। তা তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।"

"কেন?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

জয়ন্তদা বললেন, "বনমালাকে আমাদের এখানে মালপত্র বইবার কাজ করতে হয়। তারপরে এই যেমন তোমরা বেড়াতে এসেছে। তোমাদের পিঠে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে বেড়িয়ে গণ্ডার হরিণ দেখাতে হয়। ছেড়ে দিলে কী করে চলবে? ছেড়ে দিলে তো বনমালা বনেই চলে যাবে। হয় তো ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক দূরে আসামের জঙ্গলেই চলে যাবে, আর কখনো ফিরে আসবে না। আমাদের অসুবিধে হয়ে যাবে।"

বুড়োদা খুশি হয়ে বলল, "ও বুঝেছি, সেই জন্যই ছুঁচলো গজাল পুঁতে বনমালাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছে, বুনো হাতিটা যাতে ওকে এসে নিয়ে যেতে না পারে।"

জয়ন্তদা বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

গোগোল হাসতে পারল না। জয়ন্তদা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল গোগোল, তুমি কথা বলছ না যে? তোমার কি মন খারাপ হয়ে গেল?"

গোগোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

জয়ন্তদা যেন একটু অবাক হয়ে হেসে বললেন, "কেন? বনমালার সঙ্গে বুনো হাতিটার বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে?"

গোগোল আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

সবাই হেসে উঠল। গোগোল হাসতে পারল না। ব্যাপারটা ওর কাছে খুবই অন্যায় মনে হল। কারণ বুনো হাতিটা বুনো হতে পারে, কিন্তু সে এত সুন্দর দেখতে, এত বিরাট তার চেহারা, অমন সুন্দর প্রকাণ্ড যার দাঁত, তাকে বিয়ে করতে না দেওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যায়। বিশেষ করে বনমালাও যখন তাই চায়। গোগোলের কাছে সকলের হাসি খুব নিষ্ঠুর মনে হল।

জয়ন্তদা বললেন, "গোগোল, তুমি কষ্ট পাচ্ছ বটে, কিন্তু ভেবে দেখ, বুনো হাতিটার ভয়ে, তোমাদের আমরা আমাদের পোষা হাতির পিঠে চাপিয়ে, গণ্ডার হরিণ দেখতে পাঠাতে পারব না। বনমালা ছাড়া যে-কোনো পোষা হাতি দেখলেই বুনোটা তাদের তাড়া করছে! হাতিটা তোমাদের আনন্দও মাটি করে দিয়েছে।"

গোগোল এদিকটা ভেবে দেখেনি। বুড়োদা মিনুদি, এমন কী বাবাও বললেন "সত্যি, আমাদের কপালটাই খারাপ। হলং-এ এসেও, হাতির পিঠে চেপে জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাব না।"

গোগোলেরও যে মনটা একটু খারাপ হল না, তা নয়। বন্য গণ্ডার হরিণ দেখার শখ ওরই বেশি ছিল। কিন্তু বুনো হাতিটার সেই আশ্চর্য সুন্দর আর বিরাট চেহারাটার কথা ভেবে, তার জন্যই ওর মনটা বেশি খারাপ হয়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা গোগোলের ঘুম ভেঙে গেল। বুড়োদা মিনুদি এখনও ঘুমোচ্ছে। পাশের

ঘরে বাবা-মায়েরও কোনো সাড়া শব্দ নেই। গোগোল খাটের মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। ছোট হাঁটুজল নদীটির বাঁ দিকে ঝাড়ালো গাছটায় অসংখ্য পাখি ডাকছে। গোগোল জানালা থেকে সরে আস্তে-আস্তে দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল। বাইরে বেরিয়ে নীচে নেমে, একেবারে ঘাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রসুইখানার পাচক বা চৌকিদার নিজেদের কাজে ব্যস্ত। কেউ গোগোলকে লক্ষ্য করল না।

গোগোল ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, স্রোতের জলে চোখ-মুখ ধুয়ে নিল। অবাক হয়ে দেখল, ওর হাতের সামনেই মাছগুলো ঘোরাফেরা করছে। ওর খুব ইচ্ছে হল, একটা মাছকে হাত দিয়ে ধরে। ওর পা খালিই ছিল। জলে নেমে পড়ল। আর একটা মাছ যেন ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওপারে নিয়ে গেল, আর চট করে হারিয়ে গেল।

গোগোল হতাশ হয়ে, ওপর দিকে তাকাল। সেই ঝাড়ালো গাছটা এখন নদীর অন্য পারে। পাখি দেখবার জন্য ও উঁচু পাড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা তুলে গাছের দিকে দেখল। প্রথমেই ওর চোখে পড়ল একটা কালো পাখি, মাথায় হলুদ রঙের ঝুঁটি। পাখিটা একবার শিস্ দিয়ে ডেকেই, হঠাৎ উড়ে গেল। তারপর আরো কয়েকটা পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। কেন? গোগোলকে দেখে ভয় পেয়েছে?

ঠিক এই সময়েই গোগোলের মনে হল, ওর মাথায় গরম দমকা বাতাস লাগল, আর মাথায় চুল উড়ে কপালে পড়ল। কিসের বাতাস? ও পিছন ফিরে তাকাল। ও প্রথমে দেখতে পেল, হাতির একটা শুঁড় ওর মাথার ওপরে। ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। ও ভাল করে তাকিয়ে দেখল, সেই বিশাল কালোয়-নীলে মেশানো বুনো হাতিটা ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রকাণ্ড বাঁ-দিকের দাঁতটা প্রায় ওর কাঁধের কাছে নেমে এসেছে।

গোগোল প্রথমটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, আর হত চকিত হয়ে ভাবল, দৌড় দেবে কি না। কিন্তু আশ্চর্য, দৌড় দেবার কথা ভাবতেই হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে, আল্‌তো করে ওর মাথায় ছোঁয়াল। আবার সেই রকম দমকা বাতাসের মতো নিশ্বাস ফেলল। ওর চুলগুলো আবার উড়ে এলোমেলো

হয়ে গেল। তারপরেই হাতিটা শুঁড় দিয়ে গোগোলের কাঁধে, পিঠে, কোমরে, এমন কী পায়েও আলতো করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন গন্ধ শুঁকল।

গোগোলের ভয়-ছমছমানি ভাবটা কেটে গেল। ও কি এই বুনো হাতিটার শুঁড়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবে? যেমন কলকাতার চিড়িয়াখানায় দিয়েছিল? ও মুখ তুলে হাতিটার চোখের দিকে তাকাল। চাউনিটা মোটেই রাগী দেখাচ্ছেনা। কুলোর মতো কান দুটো নাড়ছে। গোগোল খুব আস্তে ওর শুঁড়ে একটু হাত বুলিয়ে দিল। অমনি বুনোটা তার শুঁড় গুটিয়ে এনে, গোগোলের ছোট নরম আঙুল গুলো শুঁকল। আঙুলের ডগাগুলো যেন লালায় ভিজে গেল। গোগোলের হাসি পেয়ে গেল।

বুনো হাতিটা হাঁ করল, তার জিভটা দেখা গেল। গোগোল বলেই উঠল, "তুমি হাসছ, না?"

বুনো শুঁড় তুলে গোগোলের কানের কাছে হালকা নিশ্বাস ফেলল। গোগোলের মনে হল ও যেন বল, "হ্যাঁ।" গোগোল আবার জিজ্ঞেস করল, "বনমালার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়নি বলে তোমার মন খুব খারাপ, না?"

বুনো গোগোলের নরম গালে শুঁড় ছুঁইয়ে দিল। এই সময়ে বাংলোর দিক থেকে অনেকের গলা শুনে, গোগোল সেদিকে তাকিয়ে দেখতে গেল। বুনো হাতিটা এবার গোগোলের পিঠে শুঁড় দিয়ে আস্তে ঠেলে দিল। গোগোল বাংলোর উল্টো দিকে দু পা এগিয়ে গেল। বুনো শুঁড় তুলে যেন হাতের মতো দেখাল, আবার গোগোলের পিঠ আস্তে ঠেলে দিল। আর মাথায় আলতো করে শুঁড় দিয়ে নিশ্বাস ফেলল। তারপরে খুব ঘন-ঘন শুঁড় আর কান নাড়তে লাগল।

বাংলোয় মনে হল, মা যেন চিৎকার করে ওকে ডাকছেন। কিন্তু গোগোল বুনোর সঙ্গে বনের দিকেই এগিয়ে চলল। বুনো মাঝে মাঝেই ওর পিঠে আস্তে করে ঠেলে দিতে লাগল, আর গালে গলায় মাথায় আল্‌তো করে ছুঁয়ে দিল।

গোগোল নির্ভয়ে বুনো হাতির আগে-আগে চলতে লাগল। দু-একবার ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিল। একবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাকে ভালবাসো, না?"

বুনো বেশ জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল। বাংলোর দিকে গোলমাল তখন চরমে। কিন্তু গোগোলের কিছুই মনে হল না। একটা অন্ধ লোককে তার লাঠি ধরে যেমন কেউ রাস্তা পার করে দেয়, ও সে ভাবেই বুনোর শুঁড় ধরে ক্রমেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপরেই হঠাৎ ভয় পেয়ে থেমে চিৎকার করে উঠল, "ওটা কী?"

বুনো বিশাল হাতি তৎক্ষণাৎ গোগোলকে আড়াল করে দাঁড়াল আর দেখল, একটা মস্ত গণ্ডার তার বাচ্চা নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। গোগোল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "গণ্ডার গণ্ডার! মা আর বাচ্চা!"

বুনো হাতি ওর কাঁধে শুঁড় দিয়ে যেন কিছু ইশারা করল, আর আবার হাঁ করল। ঠিক যেন হাসছে। সে আবার তার শুঁড় ধরে এগিয়ে চলল। চলতে চলতে গোগোলের মাথা সমান ঘাসবনে চলে এল। আর হঠাৎ একটা ময়ুর ডানা ঝাপটিয়ে আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে দূরে গিয়ে নামল।

গোগোল প্রথমটায় চমকিয়ে উঠলেও তারপরেই খুশি হয়ে চিৎকার করে উঠল, "ময়ুর ময়ুর।"

ওর কথা শেষ হতে হতেই, হাত দশেক দূরেই এক দল হরিণ ঠিক যেন ঢেউয়ের মতো ছুটে পালিয়ে গেল। গোগোল হাততালি দিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল "হরিণ হরিণ!"

বুনো ওর হাতের ওপর শুঁড় ছুঁইয়ে আবার আল্‌তো করে পিছন থেকে ঠেলে দিল। গোগোল আর

তখন এগোবে কি! ওর আশে-পাশে থেকে এক-একটি হরিণ ছিটকে দিগ্-বিদিকে ছুটতে লাগল। ময়ূর আর বুনো মুরগি থেকে থেকেই উড়তে লাগল। গোগোল যেন আনন্দে পাগল হয়ে গেল, আর হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। বুনো হাতিটা তার বিশাল শরীর দুলিয়ে,শুঁড় আর কান দুটো খুব নাড়তে লাগল। যেন সেও বেশ খুশি!

আরো খানিকটা এগিয়ে, একটা মোটা গাছের গুড়ির কাছে একটা ছোট বাঘের মতো জানোয়ার দেখে গোগোল ভয় পেয়ে থমকে গেল। হাত বাড়িয়ে বুনোর শুঁড় ধরে বলল, "বাঘ বাঘ!"

গোগোল জানে না, আসলে ওটা বাঘ নয়, একটা চিতা বিড়াল। এই অঞ্চলের বনে প্রায়ই এদের দেখা যায়। চিতা বিড়ালটা বিশাল হাতি দেখেই, ভয়ে গুটিয়ে গিয়ে গর্‌গর্ করে উঠল। বুনো গোগোলের হাত থেকে শুঁড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে দু পা এগিয়ে যেতেই চিতা বিড়ালটা একলাফ দিয়ে চোঁ চাঁ দৌড় দিল।

গোগোল হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। বুনো শুঁড় তুলে হাঁ করল। ঠিক যেন হাসছে! ঠিক এ সময়েই কাছাকাছি থেকে লোকজনের গলার স্বর শোনা গেল। গোগোল স্পষ্ট বাবার ডাক শুনতে পেল "গোগোল গোগোল। তুমি কোথায়?"

গোগোল চিৎকার করে জবাব দিল, "আমি এখানে।" তারপরেই প্রায় একশো হাত দূরে, একদল লোককে দেখা গেল। তাদের মধ্যে বাবা আর জয়ন্তদা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বুনো হাতি এই প্রথম অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠল, আর তার কান দুটো মাথার পিছন দিকে লেপটে গেল। গোগোল স্পষ্ট দেখলো, তার চোখের চাওনিতে রাগ ফুটে উঠেছে! সে শুঁড় দিয়ে গোগোলের কাধে আলতো করে ছোঁয়াল।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "তোমার রাগ হচ্ছে?"

বুনো গোগোলকে আড়াল করে, একশো হাত দূরে দলটার মুখোমুখি দাঁড়াল। বাবা চিৎকার করে বললেন, "গোগোল, ও পাগলা হাতি, তোমাকে মেরে ফেলবে।"

গোগোল বলল, "না, ও আমার বন্ধু হয়ে গেছে।"

বুনো কী বুঝল, কে জানে। সে হঠাৎ দলটার দিকে দৌড়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটার সঙ্গে বাবা আর জয়ন্তদাও পিছন ফিরে দৌড় দিলেন। কিন্তু চলে গেল না। জয়ন্তদা চিৎকার করে বললেন, "গোগোল, তুমি ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাংলোয় ফিরে এসো।"

গোগোল বলল, "আপনারা চলে যান।"

গোগোলের কথা শুনে, বাবা, জয়ন্তদা সবাইকে নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। গোগোল বুনোর কাছে এগিয়ে এল। বুনো ওর গায়ে মুখে শুঁড় ছুঁইয়ে শুঁকল, কিন্তু তার রাগ ভাবটা এখনো আছে।

গোগোল বলল, "এবার ফিরে চলো, আমার মা কাঁদছে।"

বুনো শুঁড় দিয়ে গোগোলের কানে একটু হাওয়া লাগিয়ে দিল। গোগোলের মনে হল, ও যেন বলছে, "খুব সাবধান। ওদের বিশ্বাস নেই।"

গোগোল বলল, "আমি আছি, তোমার কোন ভয় নেই।" বলে বুনোর শুঁড় ধরে এগিয়ে চলল।

বুনোহাতি প্রথমে যেন একটু আপত্তি করল, তারপরে গোগোলের পিছনে-পিছনে এগিয়ে গেল। গোগোল বাংলোর পথ চেনে না। বুনোই তাকে টেনে, আস্তে করে ঠেলে, বাংলোর হাতায় এনে ফেলল। কিন্তু সে আর এগোলো না। দূরে বিরাট ভিড়

(শেষাংশ ১৪৩ পৃষ্ঠায়)

ছায়া মূর্তি (১৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নেমে এলুম আবার কেবিনে।

স্থির করলুম, এবার সাউণ্ড টেপ করবো। ক্যামেরা সঙ্গে রাখবো। সাউণ্ড ধরে ফোটো তুলতে চেষ্টা করবো। নেগেটিভে কিছু ধরা পড়ে কিনা—দেখলে ক্ষতি কি! সকলকে আশ্বাস দিয়ে দরজা বন্ধ করেছি।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি। ঘুম চোখে আসছে না। ভাবছি, এ এক উৎপাত হ'ল নতুন জাহাজ কিনে। জাপানীদের জাহাজটা গ্রীক কোম্পানী কিনেছে সবে।

এক রাত্তিরে জাহাজটা একটা দুর্ভেদ্য রহস্যপুরী হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। আগের জাহাজটায় এদেশের একূল ওদেশের অকূলে গিয়ে ভিড়েছি। সুস্থ মন নিয়ে সুস্থ দেহ নিয়ে। আনন্দে মাতায়ারা হ'য়ে উঠেছি সবাই। সবাইয়ের এক মন এক প্রাণ।

সুখের এই ভাবনাটুকুও সইল না এই পোড়া জাহাজের। সব আলো নিভে গেল। আমিও উঠে পড়লুম সুখশয়ান থেকে গা ঝেড়ে তাড়াতাড়ি। অ্যালার্মবেল বেজে উঠেছে। বেরিয়ে দেখি, টর্চ হাতে নিচে নামছে সেকেণ্ড এঞ্জিনীয়ার আর অফিসার। এঞ্জিন ঘরে যাবে ওরা জেনারেটর দেখতে।

আমি টেপ ক্যামেরা নিয়ে ওপরে উঠে গেলুম। ব্রীজে এসেছি। হাঁপাচ্ছি। নিচে থেকে ফোন এলো এঞ্জিন ঘরে যেতে হবে এখুনি।

টেপ চালিয়ে রেখেই নেমেছি নিচে।

এঞ্জিন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সকলে। ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। সেই কান্না ভেসে আসছে কানে। মনে হ'চ্ছে জেনারেটরের কাছ থেকে।

আমি ঢুকতে যাচ্ছি, বাধা দিচ্ছে ওরা। ভেতরে যেতে দেবে না কিছুতেই।

দাদুর মুখ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে।

দ্বিগুণ সাহস এসে গেছে। আমি জানি কিছু খারাপ হবে না আমার। এ বিষয়ে নিশ্চিত আমি।

মনে পড়েছে জীবনমরণ সন্ধিক্ষণের কথা। মনে পড়েছেই বলি কেন—মনে মনে রয়েছেই তো সেদিন আমার সর্বক্ষণ।

বিকানিরে যাবো। মা কিছুতেই যেতে দেবে না। দাদুর বড্ড শরীর খারাপ। এ সময়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বেড়াতে বেরনো মোটে সাজে না। তাছাড়া নাতিঅন্ত প্রাণ দাদুর। যদিও বা বাঁচত দু'দিন আর আশা নেই।

আমি বলেছি দাদুকে।

দাদু দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে আমায়। বলেছে, ওর আনন্দে বাধা দিচ্ছ কেন বৌমা! ছেড়ে দাও! ও আমায় প্রাণের জিনিস। চলে গেলে, ওকে ছেড়ে কি কোথায় যেতে পারবো আমি। ওকে আসলে আগলে বেড়াবো। দাদুভাই আমার ছেলেমানুষ, ভালোমানুষ। না দেখলে দেখবে কে? বিকানিরে যাচ্ছি ট্রেনে চেপে। গানবাজনা গল্পগুজব সবই চলছে বন্ধুদের মধ্যে। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে কেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি, বুঝতে পারছি না।

মাঝপথেরও বেশী গিয়ে পড়েছি তখন। কেবলই মনে হ'চ্ছে, কে যেন আমায় ডাকছে। ডাকটা এত সত্যি মনে হ'তে লাগল যে, মনের কান থেকে বাইরের কানে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি বুঝি। দাদু বলছে, শীগগির নেমে এসো সজল। সজল সজল সজ.....।

আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলুম।

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে নেমে পড়লুম স্টেশন আসতেই। আচ্ছন্ন বোধটা কেটেছে যখন, তখন ট্রেন চোখের বাইরে অদৃশ্য।

আমি ভাবলুম, কি বিপদেই না পড়লুম। বুক ভরা অভিমান নিয়ে ফিরে এসেছি দাদুকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দোব দুকথা। তোমার মন কেমন প্রাণ কেমনে এই দশা।

অভিযোগ দাখিল করতে আর হয়নি আমায়। দাদু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে আমি যাবার পর। কাগজে খবর দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক। আমাদের ট্রেনটাই অ্যাক্সিডেন্টের মুখে পড়েছে। মা বলেছে, সত্যি সত্যিই দাদুরকথা মিলে গেছে। সঙ্গে আছে এটাও সত্যি।

দাদুর হাসি মাখানো মুখ আবার দেখছি। কে যেন ভেতরে জোর করে ঠেলে দিল। জেনারেটরের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ছায়া-ছায়া মূর্তি। আমি এগোচ্ছি। মূর্তি মিলিয়ে গেল।

কান্না থেমে গেছে।

বেরিয়ে এসে আমি ব্ল্যাকফাইল ঘেঁটে এটার রহস্য বার করতে চেষ্টা করেছি।

প্রায় বছর চার আগে এই জাহাজের থার্ড এঞ্জিনীয়ার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।

সাউথ আমেরিকার পোর্টে মাললোডিং হচ্ছিল তখন হঠাৎ জাহাজে লোডশেডিং হ'য়ে যায়। সেকেণ্ড এঞ্জিনীয়ার থার্ড এঞ্জিনীয়ারকে জেনারেটর ঠিক করতে বলে।

এঞ্জিন ঘরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জেনারেটর ঠিক হ'য়ে যায়। কিন্তু গায়ে একটা ফাটল ধরে ফিটিংয়ের সময়।

সেকেণ্ড এঞ্জিনীয়ার ওটাকে কেটে বাদ দিয়ে নতুন স্টীল ফিট করতে আদেশ দেয়। জেনারেটর চলছিল। গ্যাসকাটার দিয়ে কাটা শেষ করেছে যে মুহূর্তে থার্ড এঞ্জিনীয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভাবে ঘরটা আলোয় আলো হয়ে ওঠে। তখুনি পুড়ে মারা যায় হতভাগ্য থার্ড এঞ্জিনীয়ার।

জেরক্সকপিতে তার যে চেহারা দেখেছি। অবিশ্যি মৃত্যুর পর নেওয়া। হুবহু ছায়ামূর্তির সঙ্গে মিল।

জেরক্সকপি থেকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখি, সেই ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। দাদুকে দেখছি! দাদুও আসছে। ছায়ামূর্তি সরে যাচ্ছে। পেছু হটছে। সরে গেল। মিলিয়ে গেল।

—×—

গোগোলের সাথে বুনো হাতি (১৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ) দাঁড়িয়ে ছিল।

গোগোল বুনোর দিকে তাকাল। তার চোখে এখন রাগ নেই, বরং গোগোলের মনে হল তার চাউনিতে কষ্ট। গোগোল তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিল। সে শুঁড় তুলে গোগোলের মাথায় তেমনি দমকা নিশ্বাস ছাড়ল। গোগোলের চুল এলো-মেলো হয়ে গেল। বুনো গোগোলের কাঁধে গলায় গালে শুঁড় ঠেকাল, ঠিক যেন আলতো করে আদর করার মতো। তারপর আস্তে-আস্তে পিছন ফিরে চলে গেল।

গোগোলের মনটা কেমন টনটন করে উঠল। ও সেই বিশাল সুন্দর হাতিটিকে যতক্ষণ দেখা গেল, দেখল। তারপরে সে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এ সময়েই ভিড়টা দৌড়ে এল। প্রথমেই মা গোগোলকে বুকে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন,

বললেন, "ওরে গোগোল, তোর জন্য ভয়েই আমি একদিন মরে যাব।"

কিন্তু মায়ের কান্নার মধ্যেও সকলেই আনন্দে হাসতে লাগল। গোগোল তাদের সঙ্গে বাংলোর বসবার ঘরে এল।

জয়ন্তদা বন্দুকটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বললেন, "এবার বলো তো গোগোল, ওই ভয়ংকর বুনো দাঁতাল হাতিটা তোমাকে কী বলল?'

গোগোল বলল, "কী আবার? ও নিজে এসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল আর বেড়াতে নিয়ে গেল।"

জয়ন্তদা অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এখন থেকে বুনো হাতিদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে।"

বাবা কিছুই বললেন না। তিনি এমনভাবে গোগোলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, গোগোল ফিরে এসেছে।

১। প্রঃ প্রথম কোন ভারতীয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে দুইশত রান অর্জন করেছিলেন?

উঃ দিলীপ সারদেশাই, ২২ রান অর্জন করে ছিলেন কিংস্টোনে ১৯৭১ সালে।

২। প্রঃ পৃথিবীতে কোন দেশ একদিনে সর্বাপেক্ষা বেশী রান করেছিল এবং কার বিরুদ্ধে?

উঃ অস্ট্রেলিয়া এসেক্স-এর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে ৭১১ রান করে ১০টি উইকেট হারিয়ে ছিল।

৩। প্রঃ বৈদেশিক কোন গাছ থেকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত মানের ক্রিকেট ব্যাট তৈয়ারী হয়।

উঃ উইলো গাছ।

৪। প্রঃ পৃথিবীতে কে প্রথম তার টেস্ট জীবনে দুইশত রান অর্জন করেছিলেন?

উঃ আর.ই. কোস্টার ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ২৮৭ রান করে ১৯০৪ সালে তার টেস্ট জীবনে প্রথম দুইশত রান করেন।

৫। প্রঃ টোকিও ওলিম্পিকে ১৯৬৪ সনে কার অধিনায়কত্বে ভারতীয় হকি দল স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল?

উঃ চরণজিৎ সিং।

৬। প্রঃ কবে প্রথম ওলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়?

৭৭৬ খ্রীঃ পূর্বে গ্রীসে প্রথম ওলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক ওলিম্পিক প্রথম ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়।

৭। প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়াম কোনটি?

উঃ স্ট্রাখোভ স্টেডিয়াম পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়াম।

৮। প্রঃ কোন সালে মহিলারা ওলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ ১৯১২ সালে।

৯। প্রঃ কোন দেশে প্রথম আন্তর্দেশীয় ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উঃ আমেরিকায় ১৮৫৯ সালে প্রথম আন্তর্দেশীয় ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০। প্রঃ আমেরিকার ফরেষ্ট হিলে কি খেলা হয়?

উঃ টেনিস।

১১। ওলিম্পিক ক্রীড়ায় ম্যারাথন প্রতিযোগিতার দূরত্ব কি?

উঃ ২৬ মাইল।

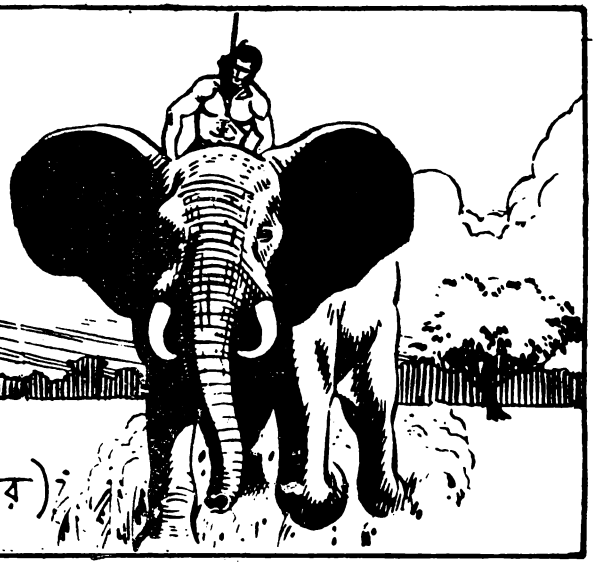

টারজান কমিকস সিরিজ
ফাঁদ
উন্মুক্ত প্রান্তরে চলাফেরা করার সময় টারজান হাতীর (টান্টরের) পিঠে চড়ে বেড়ায়।
এভাবে দ্রুত যাওয়া যায় নিরাপদও বটে।
কেনিয়া পুলিসের হেলিকপ্টার এখানে কেন?
ঘর-র-র-র-র-র-র

ভয় নেই ট্যান্টর! শত্রু নয় বন্ধু
ব্রর--র-র-র
ঘর-র-র
দা-আ-রা!
ওটা কি?
শুনতে পাচ্ছনা সিঁড়ি নামিয়েছে, ওপরে যেতে বলছে
এখানে দাঁড়া ট্যান্টর!
টারজান!
মভিরো! পুলিস ক্যাপটেন বয়েড!

[পরে পাবেন]

গ্রেট এক্সপেক্টেসনস

চার্লস ডিকেন্‌স

অনুবাদ : ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

চার্লস ডিকেনস

জন্ম ১৮১২, মৃত্যু ১৮৭০। গরীব কেরানীর ছেলে। পয়সার অভাবে পড়াশোনার সুযোগ বিশেষ পাননি। মাত্র ১৫ বছর বয়সে এক উকীলের অফিসে বেয়ারার চাকরি পান। তারপর শর্টহ্যাণ্ড শিখেছেন, নিজের চেষ্টায় বাড়িতে পড়াশোনা করেছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টার হয়েছেন ডিকেনস। ১৮৩৬-৩৭ এ প্রকাশিত PICK-WICK PAPERS তাঁকে সমকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিকের মর্যাদা এনে দেয়। হাস্যরসের ফোয়ারা, আকর্ষণীয় অনেক চরিত্র। বইটি বড় হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই পড়বে। প্রথম জীবনের শোচনীয় দারিদ্র্য, অভাব, বুভুক্ষার কথা কোনদিন ভুলতে পারেননি ডিকেনস। তাঁর নানা উপন্যাসে গরীবের দুঃখের কথা বড় মরমী ভাষা ও আঙ্গিকে লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনের কথা। ১৮৩৭-৩৯ এ লেখা Oliver Twist এ সেকালের ইংল্যাণ্ডে অনাথাশ্রমগুলোর শোচনীয় অবস্থা এবং বস্তির গরীব মানুষের দুঃখদুর্দশার ছবি আঁকা হয়েছে। ১৮৩৮-৩৯ এ লেখা Nicholas Nickleby গ্রামের স্কুলগুলোর হৃদয়হীন ও নির্বোধ ব্যবস্থাপনার সম্বন্ধে বিদ্রূপে মুখর। এরপর ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করলেন ডিকেনস। তাঁর এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা A Tale of Two Cities। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাস পৃথিবীর সর্বকালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অন্যতম। সমালোচকদের মতে, ডিকেনসের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ১৮৪৯-৫০-এ নিজের জীবনের ছায়ায় লেখা David Copperfield। যে কাহিনীটা এখন তোমাদের শোনাবো, সেই Great Expectations লেখা হয়েছিল ১৮৬০-৬১-তে। ডিকেনসের উপন্যাসের একটা বিশেষ দিক হল নাটকীয়তা। গল্প বলার জন্যে সংলাপের ওপর খুব বেশী জোর দিতেন ডিকেনস। তিনি কোন চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বা কোন ঘটনার যৌক্তিকতা-র খুব বেশী গভীরে যেতেননা। তবুও চরিত্র ও ঘটনা খুব স্পষ্ট, জীবন্ত হয়ে উঠতো এই নাটকীয় ও শক্তিশালী সংলাপের গুণে। অতিনাটকীয়তা এবং ভাবপ্রবণতা তাঁর রচনায় প্রায় প্রতি পাতায় দেখা যাবে। ঘটনা যেন বড়দ্রুত ঘটে। পরিস্থিতি যেন বড় দ্রুত বদলে যায়। নাটকেই যা স্বাভাবিক। আসলে ডিকনস-এর ব্যক্তিত্বের একটা নাটকীয় দিক ছিল। আমেরিকায় লেকচার দিতে যেয়ে তিনি নিজের উপন্যাসের ডায়ালগ অভিনেতার মত পড়ে শোনাতেন। এই নাটকীয়তা মাঝে মাঝে তাঁর উপন্যাসে চরিত্র ও বক্তব্যের অতিরঞ্জন ঘটিয়েছে, কখনও বা অতিনাটকীয়তা যুক্তির বিরুদ্ধে যেয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। কিন্তু গল্প বলার এমনই অসাধারণ আঙ্গিক তিনি আয়ত্ত করেছিলেন যে সাধারণ পাঠক আজও ডিকেনসের ভক্ত। একটা কথাই বারবার নানা উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন চার্লস ডিকেনস। যুক্তি বড় নিষ্ফল এবং হাসি ও করুণাই সময়ের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো—রবীন্দ্রনাথের মত ডিকেনসও যেন বলতে চেয়েছেন। দুনিয়ার যতো গরীব, হাঘরে মানুষ, যারা ক্ষিধেয় কাঁদে, শীতে কাঁপে : চার্লস ডিকেনস তাদের আপন জন। ডিকেনসের উপন্যাসে গরীবের ছেলে অনেক দুঃখের ভেতর দিয়ে শেষ অবধি বড় হওয়ার সুযোগ পায়, সে বড় হয়, সুখী হয়। বাস্তবে হয়তো তা হয়না। তবু ডিকেনসের উপন্যাস পড়ে যুগ যুগ ধরে কতো গরীবের ছেলে স্বপ্ন দেখেছে, অলিভার টুইস্ট বা ডেভিড কপারফিল্ডের মত তাদেরও ভাগ্যের চাকা একদিন ঘুরে যাবে। তাদের এই স্বপ্ন দেখতে যে সাহায্য করেছে, গরীবের সেই একান্ত আপন-জন চার্লস ডিকেনসকে তোমরাও ভালবাসবে। ডিকেনসের লেখা পড়াই লেখকের উদ্দেশে তোমাদের ভালবাসা জানানোর উপায়। এসো, আমরা এখন ডিকেনসের উপন্যাস পড়ি···

● এক

শীতের সেই বিকেলটার কথা আজও আমার মনে আসে। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আমি তখন ছোট্ট ছেলে। গির্জার লাগোয়া গোরস্থানে আমি চুপটি করে একলা বসে ছিলাম। আমার মা-বাবা, পাঁচ ভাই: কেউ নেই, সবাই মরে গেছে। ওদের কবর দেওয়া হয়েছে এইখানে। এখন কবরের ওপর ঘাস গজিয়েছে। ঘাসের বুক ছুঁয়ে শন্‌শন্ হাওয়া বইছে। গোরস্থান যেখানে শেষ, সেখানে শুরু হয়েছে নীচু সমতল জলাভূমি। কয়েকটা গরু ওখানে চরছে। আরো দূরে নদী দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে আসছে শন্‌শন্ হাওয়া।

আমি একা।

আমার চোখে জল।

আমি কাঁদছি।

হঠাৎ কে যেন রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—

আমি চুপটি করে একলা বসেছিলাম।

'কান্না থামাও!'

কবরের আড়াল থেকে উঠে এসেছে একটা মানুষ। তার পরনে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক। পোশাকের রঙ ধূসর। টুপির বদলে তার মাথায় পুরোনো একটা রুমাল বাঁধা। তার পায়ের জুতোজোড়া দোমড়ানো মচকানো। তার দু'পা লোহার শেকলে বাঁধা।

এতোক্ষণে আমি বুঝলাম, লোকটা জেল-পালানো কয়েদী!!!

'চুপচাপ থাকো। নইলে মরবে'—লোকটা বললো।

'প্লীজ, সার, আমাকে মারবেননা!'

'তোমার নাম?'

'পিপ্'।

'কোথায় থাকো?'

জবাবে আমি আঙুল বাড়িয়ে এক মাইল দূরে আমাদের বাড়িটা ওকে দেখাই।

আমার পকেট হাতড়ে এক টুকরা রুটি পেলে লোকটা। মোটে এক টুকরোই ছিল। লোকটা গোগ্রাসে রুটি গিললো। যেন অনেকদিন ওর পেটে দানাপানি কিছু পড়েনি।

'তোমার মা কোথায়?'

'ওইখানে, সার।'

লোকটা লাফিয়ে উঠে পালাতে যাচ্ছিল। তারপর পেছন ফিরে তাকাতে আমি মায়ের কবরটা দেখিয়ে বললাম—

'আমার মা ওইখানে—'

'ও, তোমার বাবা? ওঁর পাশে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'হা! তুমি কার সঙ্গে থাকো?'

'আমার দিদির সঙ্গে। আমার দিদি গাঁয়ের কামার জো গারগেরীকে বিয়ে করেছে।'

'কামার?'

—লোকটা নিজের দুপায়ে বাঁধা লোহার শেকলটা দেখে বলে—'ফাইল চেনো? উখা, যা দিয়ে ঘসে ঘসে ধাতু কাটা যায়?'

'হ্যাঁ সার।'

'খাবার আনতে পারবে তো? খাবার আর একটা উখা।

নই বলে তোমায় আমি খুন করবো।'

আমি জলাভূমির দিকে তাকাই। আমার ভয় হয়।

'প্লীজ, সার, আমাকে এভাবে মাটিতে ঠেসে ধরবেন না। বসতে দিন। তাহলে আপনার কথা শোনা আমার পক্ষে সহজ হবে।'

'কাল সকালে উখা আর খাবার এনো। আমাকে তুমি এখানে দেখেছো, এই কথাটা কাউকে বলোনা। তাহলে আমিও তোমার কোন ক্ষতি করবো না।'

'হ্যাঁ, সার।'

'ছাখো, আমি একা নই। আমার সঙ্গে আর একজন পলাতক কয়েদী আছে। তার বয়স কম। সে স্বভাবে নিষ্ঠুর। সে তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি তাকে থামিয়েছি। তুমি কাল সকালে ফাইল আর খাবার আনবে। নইলে ওই ছোকরা কয়েদী তোমায় মারবে। এখন তুমি বাড়ি যেতে পারো।'

লোকটা অতি কষ্টে গির্জার দেওয়াল ডিঙোলো।

তারপর আমার দিকে ফিরে তাকাতেই আমি এক ছুট লাগালাম আমার বাড়ির দিকে।

● দুই

আমার দিদি আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়। ভীষণ বদমেজাজী। আমাকে দেখতে পারে না। আমার জামাইবাবু জো-র সঙ্গে প্রায়ই খারাপ ব্যবহার করে। গির্জা থেকে ছুটে বাড়ি ফিরে দেখি, কামারশালার হাপরের ওঠানামা বন্ধ। জো রান্নাঘরে একা বসে আছে। জোর দয়ামায়া আছে, তবে বুদ্ধিশুদ্ধি কম। আমায় দেখে জো বললো—'পিপ, তোমার দিদি বেত হাতে নিয়ে তোমায় খুঁজতে বেরিয়েছে। তুমি বাড়ি ফিরতে বড্ড দেরী করেছো।'

একটু পরেই দিদির গলা শোনা গেল।

'কোথায় ছিলি এতোক্ষণ? আমি ভেবে মরছি—'

'দিদি, আমি গির্জার লাগোয়া কবরখানায় গিয়েছিলাম।'

'কবরখানা! আমি তোকে 'খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে না রাখলে তুই এতোদিনে মরে ওই কবরের তলায় চলে যেতিস—'

জলাভূমির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম পায়ে—লোহার-শেকল বাঁধা সেই জেলপালানো কয়েদীর কথা। তার বন্ধু ভয়ংকর নিষ্ঠুর প্রকৃতির সেই পলাতক কয়েদী যুবকের কথা। আর কাল সকালে উখা আর খাবার নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতির কথা।

দিদি টেবিলে আমাদের খাবার সাজাচ্ছিল। জো ভয়ে ভয়ে আমার দিদির দিকে তাকাচ্ছে। আমি জানি, জামাইবাবু দিদিকে বড্ড ভয় করে।

আমার খিদে পেয়েছিল। তবু আমি দিদির দেওয়া রুটির টুকরোটা খেলাম না। রুটি আর মাখন আমি কোটের আড়ালে লুকিয়ে রাখলাম। কাল সকালে জেল-পালানো ওই কয়েদী আর তার বন্ধু খাবে। বেচারারা কতোদিন না খেয়ে থাকবে? আমরাও তো গরীব। আমাদের ঘরে বেশী খাবার নেই। একটু পরে রুটি আর মাখন আমি আমার ঘরে লুকিয়ে রাখলাম।

খাওয়ার পরে আমরা আগুনের ধারে বসলাম।

বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে।

হঠাৎ···

দূর থেকে ভেসে এল বন্দুকের গুলির শব্দ।

'জো, গুলির আওয়াজ কেন আসছে?'

'সবাইকে জানানো হচ্ছে যে একজন কয়েদী পালিয়েছে। কাল রাতে একজন পালিয়েছিল। আজরাতে আবার হয়তো একজন পালিয়েছে।'

একটু পরে আমি দিদিকে সওয়াল করলাম—

'দিদি, গুলির শব্দ কোথা থেকে আসছে?'

'জেল সব কয়েদীতে ভর্তি। তাই কিছু কয়েদীকে জাহাজে বন্দী রাখা হয়। এসব জাহাজ কোথাও যায় না। নদীর বুকে নিশ্চল ভাসে। ওই জলাভূমির কাছে নদীতে এরকম জাহাজ আছে। সেখান থেকে কয়েদীরা পালিয়েছে।'

'ওদের কয়েদ করা হল কেন?'

'ওরা খুন করেছে, নয়তো চুরি করেছে। ওরা খারাপ লোক। খারাপ লোকেরা জেলে যায়। এবং ··· খারাপ ছেলেরা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে। আর কোন কথা নয়। এখন ঘুমুতে যাও।'

● তিন

পরের দিন সকালে আমি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। খানিকটা কেক চুরি করে আমি একটুকরো কাপড়ে ওটা মুড়ে নিলাম। কিছুটা ব্রাণ্ডিও চুরি করলাম। মদটা আমি বোতলে ঢেলে নিলাম। রান্নাঘরের দরজা খুলে কামারশালা থেকে একটা উখা চুরি করলাম। তারপর আমি জলাভূমির দিকে ছুটে গেলাম।

সকালের আবহাওয়া ভিজে-ভিজে। খুব কুয়াশা পড়েছে। দেওয়াল আর গেট সব ভিজে। আমাদের গাঁয়ে ঢোকার পথনির্দেশক সাইনপোস্টটা অবধি কুয়াশার দরুন দেখা যাচ্ছেনা, কাছে এলে তবে ওটা নজরে আসে। জলা-ভূমিতে আরও কুয়াশা। রাস্তা খুঁজে পাওয়াই শক্ত।

কুয়াশার দরুন পথ হারিয়ে শেষ অবধি নদীর ধার দিয়ে দ্রুত হেঁটে ঠিক রাস্তায় ফিরে এলাম। নদীর ধারে সেই কয়েদী আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঝিমুচ্ছে। আমি ওর কাঁধ খুব আস্তে ছুঁলে ও চমকে লাফিয়ে উঠলো।

না, আমার দেখা সেই জেলপালানো কয়েদী এ নয়। এ হল তারই যুবক সাথী। এও জেল থেকে পালিয়ে এখানে লুকিয়ে আছে। এর পরনে রুক্ষ ধূসর পোশাক। এর পায়ে শেকল বাঁধা, মাথায় মস্ত টুপি। ও চেঁচিয়ে উঠে আমায় মারতে এলো। আমি ছুটে পালালাম। কুয়াশার আড়ালে ওকে আর দেখা গেলনা।

একটু পরে আগের দিনে দেখা সেই প্রথম পলাতক কয়েদীর সঙ্গে আবার দেখা হল। খাবারটা তাকে দিলাম। বেচারা খুব তাড়াতাড়ি খাবারটা খাচ্ছিল। বোতলে ব্রানডি আছে শুনে খুশী হয়ে খাওয়া থামিয়ে ও খানিক মদ গিললো। মদের বোতলটা ধরতে যেয়ে ওর হাত কাঁপছিল।

'মনে হচ্ছে, তোমার শরীর খারাপ—'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'তুমি ভিজে মাটির ওপর সারারাত শুয়েছো।'

'ওসব কথা থাক। আমাকে প্রথমে খেতে হবে। যদি আমার ফাঁসি হয়, তবুও প্রথমে আমি খাবারটা খেয়ে নিই।'

খেতে খেতে সে চারপাশে তাকায়, কান পেতে শোনে। কেউ আসছে কিনা ····

'তুমি কাউকে সঙ্গে আনোনিতো?'

'না, সার।'

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমার বয়স কম। বয়স বাড়লে মানুষ খারাপ হয়। তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সৈনিকদের সঙ্গে আনবে, এ আমার বিশ্বাস হয়না।'

ওর জন্যে আমার মন খারাপ লাগে।

ও খাওয়া শেষ করলে আমি বলি—

'খাবারটা তোমার ভালো লাগলো বলে আমি খুশী, তোমার বন্ধুকে কেকের ভাগ দিলেনা?'

'ও খাবার চায়না।'

'কিন্তু ওকে দেখলে মনে হয়, ও ক্ষুধার্ত।'

'দেখলে? কোথায় দেখলে? কখন দেখলে?'

'এইমাত্র, ওইখানে দেখলাম। ও ঝিমোচ্ছিল। আমি ভাবলাম, বুঝি তুমিই ··· তোমার মত পোশাক, মাথায় তোমারই মত টুপি, পায়ে শেকল বাঁধা। তুমি কাল রাতে বন্দুকের গুলির শব্দ শুনছো?'

'বন্দুকের গুলি? তার মানে কয়েদী-জাহাজ থেকে কাল রাতেও কেউ পালিয়েছে। লোকটাকে ভালোভাবে দেখেছো? অস্বাভাবিক কিছু দেখলে নাকি?'

'ওর মুখে দারুণ চোট লেগেছে।'

'বাঁ দিকে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'লোকটা এখন কোথায়?'

কিন্তু সেই লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেলনা।

উখা দিয়ে পায়ের শেকল কাটার চেষ্টা করছিল প্রথম পলাতক কয়েদী। ওখান থেকে দূরে চলে এলাম, তখনও কানে আসছিল লোহার শেকলে উখা ঘষার শব্দ।

● চার

ক্রিসমাস ডে-র সকাল।

বেলা দেড়টায় ডিনারে নেমন্তন্ন করা হয়েছে আমাদের গির্জার পাদ্রীর সহকারী মিস্টার ওপ সল, পামবলচুক

কাকা আর হাব্‌ল দম্পতিকে। দিদি আজ নতুন পোশাকে সেজেছে। প্রথম এলো পামবলচুক কাকা। অন্যবারের মত এবারও সে সঙ্গে এনেছে দুবোতল মদ। আমার দিদি ওকে ধন্যবাদ জানালো। 'একটু ব্রানডি খাও, কাকা।'

দিদির কথা শুনে আমি ভয় পেলাম। পলাতক কয়েদীর জন্যে খানিকটা ব্রানডি বোতল থেকে ঢেলে নিয়ে তার জায়গায় আমি মদের বোতলে জল ঢেলে দিয়েছি। এখন কাকা যদি বলে, এটা জলমেশানো ব্রানডি, তাহলে আমার দিদি বুঝে যাবে যে আমি ব্রানডি চুরি করেছি।

গ্লাসের সমস্ত ব্রানডি এক চুমুকে খেলো কাকা। তার পরই ও চেয়ারে ঢলে পড়লো। আমার দিদি জামাইবাবু তাড়াতাড়ি ওকে ধরলো। কাকা বললো—

'ব্রানডিতে ওষুধ মেশানো।'

দিদি অবাক। 'বোতলে ওষুধ কোথা থেকে এলো?'

আসলে আমার জ্বরের সময় যে তেতো ওষুধ আমায় খেতে হয়েছে, জলের বদলে ভুল করে জগ থেকে সেটাই আমি মদের বোতলে ঢেলে দিয়েছি।

গরম জলে 'জিন্' মদ মিশিয়ে খেতে চাইলো কাকা। দিদি এসব নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে উঠলো যে কে মদের বোতলে ওষুধ মিশিয়েছে তাই নিয়ে ও মাথা ঘামালোনা।

আমার জামাইবাবু জো প্লেট আনতে গেল। দিদি গেল কেক আনতে।

আমি আবার ভয় পেলাম!

কেকটা চুরি করে আমি জেলপালানো কয়েদীকে খাইয়েছি। এখন দিদি সব বুঝে যাবে।

হঠাৎ···

দরজা খুললো।

খোলা দরজার সামনে কয়েকজন সৈনিক। একজনের হাতে একজোড়া হাতকড়া। 'তাড়াতাড়ি এদিকে এসো'— সে বললো।

● পাঁচ

রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে দিদি বললো—

'কেকটা কোথায় গেল?'

সৈনিকদের অফিসার চারপাশে তাকালো, তারপর বললো—

'কিছু মনে করবেন না। আমরা রাজকীয় বাহিনীর সৈনিক। জেলপালানো এক কয়েদীকে খুজছি। কামারকে আমাদের দরকার। একটা হাতকড়া ভেঙে গেছে, জুড়ে দিতে হবে।'

আমার জামাইবাবু জো বললো—

'দুঘণ্টা লাগবে।'

'তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করো। আমার সৈনিকেরা তোমায় সাহায্য করবে।'

এই সব ঝামেলায় কেকের কথা বেমালুম ভুলেই গেল আমার দিদি। অফিসার জানতে চাইলো—

'জলাভূমি এখান থেকে কতো দূরে?'

'ঠিক এক মাইল', দিদি জানালো।

'বেশী দূর নয়। আমরা সূর্যাস্তের সময় ওখানে পৌচুবো।

দুজন কয়েদী প্রিজন-শিপ থেকে পালিয়ে ওই জলাভূমিতে লুকিয়ে আছে। ওদের ধরতে হবে। আপনারা কেউ ওদের দেখেছেন?'

আমি ছাড়া সবাই বললো, না। আমাকে জিজ্ঞাসা করার কথা কারো মাথায় এলো না।

জোর কাজ শেষ হলে জো, আমি এবং মিস্টার ওপসন সৈনিকদের সঙ্গে জলাভূমির দিকে রওনা হলাম। আমার জামাইবাবু জো চুপিচুপি আমার কানে কানে বলে—

'সৈনিকরা জেলপালানো কয়েদীদের ধরতে না পারলে আমি খুশী হবো, পিপ। ওরা যদি পালায়, তুমি আমার কাছ থেকে একটা উপহার পাবে।'

দুতিন জন সৈনিক প্রথমে গির্জার লাগোয়া জমিতে কবর-গুলো খুঁজে দেখলো। একটু পরেই আমাদের কানে এলো চিৎকারের শব্দ। একটু দূরে আমার দেখা প্রথম কয়েদী দ্বিতীয় কয়েদীর সঙ্গে মারামারি করছিল। ওদের শরীর রক্তাক্ত। দুজনকেই ধরে ফেললো সৈনিকরা।

'আমি ওকে ধরিয়ে দিয়েছি', প্রথম কয়েদী বললো, 'ও তা জানে। এতেই আমার আনন্দ।'

দু নম্বর কয়েদী আহত। সে কোন কথা বললো না।

দুজনেরই হাতে হাতকড়া লাগানো হল।

এবার দুনম্বর কয়েদী বললো—

'প্রহরী, জেনে রাখো যে ওই লোকটা আমায় খুন করতে চেয়েছিল।'

প্রথম কয়েদী চেঁচিয়ে উঠলো—

'ও মিথ্যে বলছে। সারা জীবন ও মিথ্যে বলেছে।'

অফিসার ওদের থামিয়ে দিল।

নদীর ধারে কাঠের তৈরী একটা কুঁড়েঘরে চুল্লীতে আগুন জ্বলছে; লণ্ঠনের আলোয় কয়েকটা বন্দুক আর নীচু খাট দেখা যাচ্ছে। তিন চারজন সৈনিক বিছানায় শুয়ে আছে। দুই কয়েদী এবং আমরা ভেতরে ঢুকি। অফিসার রিপোর্ট লেখে। তারপর দ্বিতীয় কয়েদীকেই প্রথমে কয়েদী-জাহাজে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সৈন্তরা।

প্রথম কয়েদী এবার অফিসারকে বললো—

'জলাভূমি থেকে একটু দূরে যে গ্রামটি আছে, সেখানকার কামারশালার সংলগ্ন বাড়ি থেকে আমি কিছু রুটি, একটা কেক এবং কিছু ব্রানডি চুরি করেছি।'

অফিসার বললো—

'জো, তোমার বাড়ি থেকে কেক চুরি গেছে?'

'আমার বউ এইমাত্র বলছিলো বটে।'

কয়েদী বললো—

'তোমার কেকটা চুরি করেছি বলে আমি দুঃখিত।'

'তুমি কেক খেয়েছো বলে আমি খুশী', জো বললে, 'কোন্ অপরাধে তোমার শাস্তি হয়েছে, আমরা তা জানিনা। তবে তুমি ক্ষিধেয় মরবে, এ আমরা চাই না। বেচারা! কি বলো, পিপ্?

অস্ফুট শব্দ করে দাঁড়ালো আমার চেনা সেই কয়েদী। নৌকো ফিরে এলো। এবার ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তীর থেকে একটু দূরে নোঙর-ফেলা বিশাল ওই কয়েদী-জাহাজে। টর্চের আলো কালো জলের বুকে জ্বলে নেভে। এখন চারপাশ নিকষ কালো। আমায় পিঠে তুলে নেয় জো।

আমার কয়েদী-বন্ধুর সঙ্গে হয়তো আর কোনদিনই আমার দেখা হবে না।

● ছয়

দু'বছর পরে। শীতের সন্ধ্যায় ঘরে বসে আগুন পোয়াচ্ছি আমি আর আমার ভালোমানুষ জামাইবাবু জো। বাজার থেকে ফিরে এল আমার দিদি আর পামবলচুক কাকা।

দিদি বললো—

'শহরের বাসিন্দা মিস হ্যাভিশ্যাম ওঁর বাড়িতে খেলার জন্য একটা বাচ্চা ছেলে খুঁজছেন। কাকা পিপের নাম করেছে। পিপ ওখানে গেলে মিস হ্যাভিশ্যাম হয়তো ওকে কিছু টাকা দেবেন।'

আমাকে স্নান করানো হল, ভালো পোশাক পরানো হল। পরের দিন সকাল দশটায় আমায় নিয়ে যাওয়া হল শহরে, মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে। সাদা পোশাক, সাদা জুতো, চুলে ফুল গোঁজা।

'তুমি কে?'

'আমি পিপ। খেলতে এসেছি।'

'কাছে এসো। আরো কাছে। আমি তো

মেয়েমানুষ। তুমি আমাকে ভয় পাও? কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে? আমি অনেকদিন রোদের আলো দেখিনি। অনেকদিন আমি এবাড়ির বাইরে যাইনি। এখানে আমি কি ছুঁয়ে আছি বলোতো?'

—বুকের বাঁধারে হাত রাখেন মহিলা।

'আপনার হৃদয়।'

'ভেঙে গেছে। কেউ খেললে আমার বড় ভালো লাগে। এসটেলাকে ডাকো।'

তিন-চারবার ডাকতে এসটেলা এলো।

'এসটেলা, এই ছেলেটির সঙ্গে তাস খেলো।

প্রথম গেম শেষ হতে এসটেলা বললো—

'ওর হাতদুটো বিচ্ছিরি খসখসে। ওর পায়ের জুতোজোড়া বড্ড মোটা।'

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এবার তাস খেলতে যেয়ে ভুল হল্ল। এসটেলা চটে গেল।

মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন—

'এসটেলা কেমন? ও তোমার সম্বন্ধে কতো খারাপ কথা বললো, তুমি কিছু বলবেনা?'

'ও খুব সুন্দরী।'

'আর কিছু?'

'ও বড্ড নিষ্ঠুর।'

'আর কিছু?'

"আমি এখন বাড়ি যেতে চাই।'

'যাবে। আগে খেলা শেষ করো।'

এসটেলা জিতলে তাসগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দেয়, হারজিৎ ওর কাছে সমান।

মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন—

'আবার দুদিন পরে এসো, পিপ। এসটেলা, ওকে নিয়ে যাও। ওকে কিছু খেতে দাও, বাড়ির ভেতরটা দেখাও।'

মোমের আলোয় অভ্যস্ত আমার চোখদুটো এবার রোদের আলোয় ঝলসে যায়। আমি নিজের বুটজোড়া ও হাতের দিকে তাকাই। আমার দুঃখ হয়।

এসটেলা খানিকটা রুটি, মাংস আর একগ্লাস বীয়ার এনে মাটিতে রাখে। ও আমার দিকে তাকায় না।

আমার কান্না আসে।

এসটেলা চলে গেলে গেটের আড়ালে মুখ ঢেকে খানিক কাঁদলাম।

তারপর খাবারটা খেলাম। খেতে ভালোই লাগলো।

একটু পরে এসটেলা চাবি এনে গেট খুলে দিল। বললো—

'তুমি কাঁদছোনা কেন?'

'চাইনা বলে।'

'তুমি কাঁদতে চাও। তুমি এতোক্ষণ কাঁদছিলে। চোখের জলে তোমার সব ঝাপসা লাগছে। তুমি এখুনি কেঁদে ফেলবে হয়তো।'

তারপর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

আমার সুখ নেইকো মনে।

● সাত

দুদিন পরে আবার গেলাম মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে। এবার ঘণ্টা বাজাতে এসটেলা দরজা খুললো। মোমবাতি হাতে অন্ধকার প্যাসেজে ও আমাকে পথ দেখায়। নীচের তলার একটা ঘরে অতিথিরা গল্প করছে। একজন বলে—

'কালে কালে কতো দেখবো।'

আবার অন্ধকার প্যাসেজ। এবার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে এসটেলা বলে—

'আমি কি সুন্দরী?'

'আমার মনে হয়, তুমি সুন্দরী।'

'আমি কি নিষ্ঠুর?'

'আগের বারের মত অতোটা নয়।'

ঠাস করে আমায় চড় মারে এসটেলা।

'এবার?'

'বলবোনা।'

'মিস হ্যাভিশ্যামকে বলে দেবে?'

'না'

'কাঁদবে না?'

'আর কোনদিন তোমার জন্যে কাঁদবো না।'

এসটেলা স্বভাবে নিষ্ঠুর। কিন্তু ওকে আমার ভালোলাগে।

এক ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। দশাসই চেহারা, শ্যামল রং। 'একে?'

এসটেলা বলে—'একটা ছেলে।'

আমার মুখটা মস্ত হাতে তুলে ভদ্রলোক বলে—

'তুমি এখানে কি করছো হে?'

'মিস হ্যাভিশ্যাম আসতে বলেছিলেন।'

'দুষ্টুমি করোনা যেন।'

আজও সাদা পোশাক পরে আছেন মিস হ্যাভিশ্যাম। অন্ধকার ঘর। মোমের ম্লান আলো। ঘরের সবকিছু ধূলোয় ঢাকা। খুব হাল্কা টেবিল-চেয়ার। লম্বা টেবিলে টেবিলক্লথ। বোধহয় অতিথিদের জন্যে পার্টির আয়োজন হচ্ছে।

'বলো তো, ওটা কি? মাকড়সার জালে ঢাকা—'

'আমি জানিনা, মাদাম।'

'ওটা আমার বিয়ের কেক। আমায় হাঁটতে সাহায্য করো'—উনি আমার কাঁধে ভর দিয়ে ঘরের চারপাশ ঘুরলেন। তারপর বললেন—

'এসটেলাকে ডাকো'

এসটেলার সঙ্গে তিনজন মহিলা এবং একজন ভদ্রলোক ভেতরে এলেন। আমার আড়ষ্ট লাগছিল। মিস হ্যাভিশ্যাম তখনও আমার গায়ে ভর দিয়ে ঘরময় ঘুরছেন। একজন মহিলা বললেন—

'খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, ম্যাথু কখনও মিস হ্যাভিশ্যামের এখানে আসে না!'

হাঁটতে হাঁটতে থেমে মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন—

'আমি মরলে মাথু দেখতে আসবে। কিন্তু, তুমি আর এসটেলা তাস খেলো। আমি দেখবো'।

আমরা অন্য ঘরে গেলাম।

তাসের খেলায় আমি এসটেলার কাছে হেরে গেলাম।

তাসের পাঁচ-ছ গেম্ খেলা হল।

এসটেলা আমার সঙ্গে কথা বললোনা।

আমাকে উঠোনে খেতে দেওয়া হল।

এদিক-ওদিক হাঁটতে হাঁটতে একটা জানলার বাইরে দাঁড়াতেই ফ্যাকাসে চেহারার এক যুবক বললো—

'তোমায় কে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে?'

'মিস্ এসটেলা।'

লোকটা আমার মাথার চুল টানলো, থাপ্পড় মারলো। বললো—'এবার আমরা মারামারি করবো।'

বাগানের শেষ প্রান্তে মারামারি শুরু হল।

আমি প্রথম ঘুঁষি মারলাম। লোকটা পড়ে গেল,, ওর নাক থেকে রক্ত ঝরছে। ভিজে কাপড় দিয়ে মুখ মুছে আবার লড়তে উঠলো লোকটা। এবারও ও হার মানলো। ওর চোখে কালশিরে। ও যুবক, সাহসী, অথচ হেরে গেল।

'তোমায় সাহায্য করতে পারি?'

'না, ধন্যবাদ।'

'গুডবাই।'

'গুডবাই।'

গেটে ফিরে দেখি, চাবি হাতে অপেক্ষা করছে এসটেলা।

৬ আট

ফ্যাকাশে চেহারার ওই লোকটার সম্বন্ধে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ওর সঙ্গে মারামারি করা আমার পক্ষে ঠিক হয়নি। হয়তো আমার শাস্তি হবে। হয়তো আমাদের বাড়ি পুলিস আসবে।

কিন্তু পরের বার মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ি যেয়ে ওই মারামারির ব্যাপারে আমায় কোন অভিযোগ শুনতে হয়নি। ফ্যাকাসে চেহারার সেই ভদ্রবংশীয় তরুণকে এবার আমি ও বাড়িতে দেখতে পাইনি।

এবার দেখলাম, মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরের সামনে একটা হুইলচেয়ার। আমার শরীরে ভর রেখে ঘুরতে ঘুরতে যখন ওঁর ক্লান্তি আসে, উনি তখন হুইলচেয়ারে বসেন। আমি তখন চেয়ারটা ঠেলি।

মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে আমার খুব ভাব জমে গেল। আমার জামাইবাবু জো-র কামারশালায় আমি কাজ শিখবো কিনা উনি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, সেরকমই কথা আছে।

আমার বড় আশা ছিল, উনি আমায় সাহায্য করবেন। কিন্তু খাবার ছাড়া আর কিছু উনি আমায় দেননি। টাকাপয়সা তো মোটেই নয়।

এদিকে বাড়িতে আমার দিদি আর পামবলচুক কাকা আশা করছে, মিস হ্যাভিশ্যাম টাকা পয়সা দিয়ে আমায় পড়াশুনো করতে এবং ভদ্রলোকের জীবনের উপযুক্ত হতে সাহায্য করবেন। তখন আমাকে আর কামারের কাজ শিখতে হবে না।

কিন্তু ওদের এইসব কথাবার্তা আমার জামাইবাবু জো একদম পছন্দ করতনা। সে আমাকে ভালোবাসতো। সে চাইতো, আমি তার কাছে থাকি, তার কামারশালায় কাজ শিখি।

আমার দিদির এটা পছন্দ নয়।

দিদি আমায় বকতো—

'শুতে যা! তোকে নিয়েই যতো ঝামেলা!'

একদিন····

মিস হ্যাভিশ্যামের কথামত জো তার সেরা পোশাক পরে ওঁর বাড়িতে এলো। এসটেলা গেট খুললে মাথার টুপি খুলে তাকে সম্মান দেখালো জো। মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে যেতে উনি বললেন—

'ওহ্, তুমিই জো গারগেরী? পিপের জামাইবাবু? তোমরাই পিপকে মানুষ করেছো, তাইনা? তুমি চাও যে ও তোমার কামারশালায় শিক্ষানবীশ থাকবে?'

মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে কথা বলতে বোধহয় সঙ্কোচ লাগছিল আমার জামাইবাবুর। সে আমাকে বললো—

'পিপ, তুমি আমার বন্ধু। কামারশালার কাজে তুমি আমায় সাহায্য করলে আমি খুব খুশী হব। কিন্তু ও কাজ তোমার ভালো না লাগলে বলো। তোমার জন্যে আর কি করা যায়, আমি দেখবো।'

মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন—

'পিপ কি বলেছে যে ও কামারশালার কাজ শিখতে চায়না?'

জো আমায় বললো—

'পিপ, তুমি তো কামারশালার কাজই শিখতে চাও—'

মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন—

'জো কাগজটাত সঙ্গে এনেছো?'

জো আমায় বললো—'এনেছি, টুপির ভেতরে। তুমি তো দেখেছো পিপ?'

মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে পিপ

মিস হ্যাভিশ্যামের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে জোকে নিয়ে হাসাহাসি করছে এসটেলা। জো দয়ালু এবং ভালো-মানুষ। তাই এসটেলার বিদ্রূপের হাসি আমার পছন্দ হয় না।

ওর হাত থেকে কাগজটাও নিয়ে আমি মিস হ্যাভিশ্যামের হাতে দিলে উনি পড়ে বললেন—

'পিপকে কামারশালায় কাজ শেখাবে বলে তুমি টাকাপয়সা নেবেনা?'

জো বললো—

'পিপ, তুমি তো জানো যে তোমায় কাজ শেখাতে আমি পয়সা নেবোনা—'

টেবিলের তলা থেকে ছোট্ট মানিব্যাগ বার করে মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন—'পিপ এখানে কাজ করেছে বলে আমায় পিপকে টাকা দিতে হবে। এই ব্যাগে পাঁচশ পাউণ্ড আছে।

'জোকে এটা দাও, পিপ।'

জো এখনও মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেনা। সে আমায় বলে—

'ধন্যবাদ, পিপ। আমরা গরীব। তাই টাকাটা আমাদের কাজে লাগবে। কিন্তু আমি তো টাকা চাইনি।'

মিস হ্যাভিশ্যাম আমাদের বিদায় জানাবার আগে জোকে ডেকে বললেন—

'পিপ ভালো ছেলে। তুমি ওকে কাজ শেখাবে। তাই টাকাটা তোমার পাওনা। মিস্টার গারগেরী, তুমি সৎলোক। সুতরাং পিপের কাছে তুমি এর থেকে বেশী টাকা আশা কোরোনা।'

একটু পরে এসটেলা গেট খুলে দিলে, আমি ও জো বাইরে গেলাম। এইসব ঘটনায় খুব অবাক হয়েছিল জো।

● নয়

বাড়িতে আমার সুখ নেই। দিদি ভালো ব্যবহার করেনা। আমরা বড্ড গরীব। আমরা ভদ্রলোক নেই। এসব নিয়ে আমার বড় লজ্জা হয়। আমি কামারশালার কাজ শিখতে চাইনি। কিন্তু সেকথা বললে জো দুঃখ পেতো।

জো-র এক সহকারী ছিল। তার নাম অরলিক। অরলিকের গায়ে দারুণ জোর। লোকটা কাউকে পছন্দ করতনা। কেউ ওকে দেখতে পারতোনা। আমি ছিলাম ওর দুচোখের বিষ। কিন্তু সেকথা ও মুখে প্রকাশ করতোনা।

একদিন····

এসটেলার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা গোপন করে আমি জোকে বললাম, আমি মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

সে সময় কামারশালায় এক টুকরো তপ্ত লাল লোহা পিটছিল অরলিক ও জো। অরলিক বললো—

'মাস্টার, ওকে ছুটি দিলে বুড়ো অরলিককেও ছুটি দিতে হবে কিন্তু।'

অরলিকের বয়স যদিও মোটে পঁচিশ, নিজেকে ও বলতো: বুড়ো অরলিক।

জো জানতে চাইলো—'তোমার ছুটির কি দরকার?'

'ওরই বা কি দরকার? ওর দরকার হলে আমারও ছুটি দরকার।'

'পিপ্ শহরে যাবে।'

'তাহলে আমিও শহরে যাবো।'

'ঠিক আছে, তুমি মন দিয়ে কাজ করছো। তাই আজকের মত আমাদের সবারই বাকি দিনটা ছুটি।'

কিন্তু কামারশালার বাইরে দাঁড়িয়ে এসব কথা শুনলো আমার ঝগড়াটি দিদি। সে বললো—

'জো, তুমি ভীষণ বোকা। ওকে ছুটি দিলে কেন? কাজ করবে না অথচ পয়সা পাবে কেন ও? তুমি এভাবে পয়সা নষ্ট করছো কেন? আমি মালিক হলে কখনোও অরলিককে এভাবে ছুটি দিতাম না।'

অরলিক চটে উঠলো। তার সঙ্গে আমার দিদির দারুণ ঝগড়া বেঁধে গেলো। জো অরলিককে মুখ সামলাতে বললেও অরলিক শুনলোনা। সে আমার দিদিকে খারাপ কথা বলতেই জামাইবাবু অরলিককে মারলো। মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো অরলিক।

শহরে যাবো বলে বাড়ির ভেতরে যেয়ে পোশাক বদলে এসে দেখলাম, জো আর অরলিকের ঝগড়া মিটে গেছে। ওরা মেঝে সাফ করছে এবং একই পাত্র থেকে মদ খাচ্ছে। তবে মার খেয়ে অরলিকের মুখে কালশিরের দাগ···

আমি মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ি যেয়ে এসটেলার খোঁজ নিলে উনি বললেন—

'এসটেলা এখন ইংল্যাণ্ড ছেড়ে অন্য দেশে গেছে। সেখানে নামী একটা স্কুলে পড়বে। ও আরও সুন্দরী হয়েছে। অনেক ছেলে ওকে ভালোবাসে। এসটেলা তোমার জীবন থেকে হারিয়ে গেলে তোমার কি দুঃখ হবে, পিপ? তুমি কি এসটেলাকে ভালোবাসো?'

আমি কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। একটু পরে মিস হ্যাভিশ্যাম আমায় বিদায় দিলে আমার মনে হল, আমার জীবন, আমার বাড়ি, আমার কাজ: সবই আমার আরও খারাপ লাগছে।

মিস হ্যাভিশ্যামের সংগে দেখা করে এই লাভটুকুই হল আমার।

শহরে মিস্টার ওপ্‌সলের সঙ্গে দেখা হল। উনি আবার নিয়ে গেলেন পামবলচুক কাকার কাছে। মিস্টার ওপ্‌সল আমার সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকারে একটা মাতালকে টলতে দেখে বললেন—

'হ্যালো! অরলিক নাকি?'

'হ্যাঁ, তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এখন আমি তোমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরবো।'

সরাইখানার দরজা খোলা। বাইরে অনেক লোক। অনেকের হাতে লম্প জ্বলছে। মিস্টার ওপসল ওদের সঙ্গে কথা বলে ছুটে ফিরে এসে বললেন—

'পিপ, জলদি চলো। তোমার বাড়িতে একটা ঝামেলা হয়েছে।'

এক ছুটে বাড়ি ফিরে দেখি···

জো, ডাক্তার, প্রতিবেশিনী সবাই ভিড় করে আছে। আমার দিদি মাটিতে শুয়ে আছে। কে যেন ওর মাথার পেছনে ঘা মেরেছে। জো যখন বাড়ি ছিলনা, তখন কে যেন আমার দিদিকে পেছন থেকে মেরেছে।

অনেক বছর ধরে···

আমরা বুঝতেও পারিনি, কে ও কাজ করেছিল।

● দশ

আমার দিদি এখন বিছানায় শুয়ে থাকে। খুবই অসুস্থ। কথা বলতে পারেনা। যা জানতে চায়, লিখে জানায়। খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমার কুঁদুলে দিদি। এখন দিদি আর রাগ করেনা।

মিস্টার ওপ্‌সলের ভাগনী বিডি এখন আমাদের বাড়ি দেখে। সে বাড়ির কাজ করে, দিদির দেখাশোনা করে। দিদি যেন ছোট্ট মেয়ে।

দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে চিরকাল খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে। তবুও দিদিকে বড্ড ভালোবাসতো জামাইবাবু। আমার জামাইবাবুর সঙ্গে বড্ড ভালো ব্যবহার করে বিডি। ও এসটেলার মত সুন্দরী নয়। কিন্তু বড্ড ভালোমানুষ।

আমি যখন আরও ছোট ছিলাম, এই বিডিই আমায় বর্ণপরিচয় শিখিয়েছিল। এখনও আমার লেখাপড়ার সময় আমার দিকে নজর রাখে।

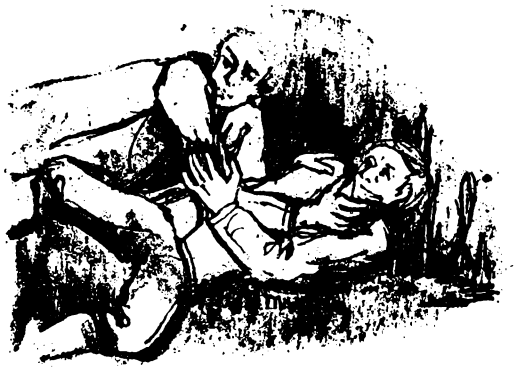

মিঃ ওপসল ও মাতাল অরলিক

আমি বলি—

'বিডি, তুমি এতো সব শিখলে কি করে?'

'শিখতে আমার ভালো লাগে। আমিই তো তোমায় বর্ণপরিচয় শিখিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, বিডি, তুমিই আমার প্রথম শিক্ষিকা। তখন কি আমিই ভেবেছিলাম যে আমার দিদি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবে আর তুমি তার জায়গা নেবে? এভাবে আমরা কাছাকাছি আসবো, আমি কোনদিন ভাবিনি।'

'বেচারা···', দিদির কথাই বলে বিডি।

'বিডি, রবিবার আমরা জলাভূমিতে বেড়াতে যাব তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

রবিবার দিদির কাছাকাছি বাড়িতে রইলো জো। আমি আর বিডি বেড়াতে গেলাম নদীর ধারে। দিনটা ভারি সুন্দর। আমি বিডিকে আমার দুঃখের কথা বলি। আমি বলি—

'আমি কামার হতে চাইনা। আমি ভদ্রলোক হতে চাই। এই কাজ, এই জীবন: আমার আর ভালো লাগেনা। মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে এসটেলা নামের এক সুন্দরী মেয়ে বলেছিল, আমি অভদ্র, বেচাল। সে আমাকে বিদ্রূপ করতো। তাই আমি ভদ্রলোক হতে চাই।'

'তাকে চটানোর জন্যে? না তাকে খুশী করার জন্যে?'

'আমি জানিনা।'

'সেই মেয়েটিকে যদি চটাতে চাও, ভদ্রলোক হয়ে কাজ নেই, তার কথা ভুলে যাও। আর যদি সেই মেয়েটিকে খুশী করতে চাও···কিন্তু যে মেয়ে তোমায় অভদ্র আর বেচাল বলে উপহাস করে, তাকে খুশী করার কি দরকার।'

'তোমার কাছে আমি কোন কিছু গোপন করবোনা। আমার এসব কথা তুমি কাউকে বোলোনা। এসটেলা সুন্দরী। আমি তাকে ভুলতে পারিনি।'

'পিপ, তুমি যখন ভদ্রলোক হবে, তুমি আর তোমার গোপন কথা আমায় বলবেনা।'

'বিডি, তুমি তো জানো, ভদ্রলোক হওয়া আমাদের মত গরীবের ভাগ্যে নেই। তাই আমার সব কথাই তুমি শুনবে।'

হাঁটতে হাঁটতে একটু পরে আমরা অরলিকের দেখা পেলাম। সে বললো—

'হ্যালো! যাচ্ছো কোথায় তোমরা? আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

বিডি আমার কানে কানে বললো—

'লোকটাকে আমার ভালো লাগেনা।'

অরলিক লোকটাকে আমিও তেমন পছন্দ করিনা। তাই ওকে বললাম—

'ধন্যবাদ, তোমার আমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই।'

অরলিক খেপে ওঠে। সে আমাদের পেছন পেছন আসে। পরে আমি জানতে চেয়েছিলাম, কেন অরলিককে পছন্দ করেনা বিডি। বিডি বললো—

'কেননা ও আমায় চায়।'

তখন থেকে অরলিককে আমার আগের থেকেও বেশী খারাপ লাগতো।

● এগারো

জোর কামারশালায় তিন বছরেরও বেশী সময় আমি কাজ শিখলাম।

এক শনিবারের রাতে সরাইখানায় খবরের কাগজ পড়ছেন মিস্টার ওপ্‌সল। জো, আমি, আরও অনেকে শুনছি, অচেনা এক ভদ্রলোক আমার সামনের চেয়ারে বসেছিলেন। হঠাৎ উনি বললেন—

'কামার-এর কাজ করে···নাম জোসেফ বা জো গারগেরী। তোমাদের মধ্যেই একজন, তাই না?'

'আমি', জো বললো।

'তোমার শিক্ষানবীশের নাম পিপ্। সে কি এখানে এসেছে?'

'আমি', এবার আমি বললাম।

এই অপরিচিত ভদ্রলোক আমায় না চিনলেও আমি ওঁকে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে দেখেছি।

উনি বললেন—

'তোমাদের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চাই। একটু সময় লাগবে। তোমাদের বাড়ি চলো।'

* * আমরা বাড়ি ফিরলে উনি মোমবাতির সামনে নোটবুক উলটে কি যেন দেখে নিয়ে বললেন—

'আমার নাম জ্যাগারস্। আমি লণ্ডনে ওকালতি করি, কোন একজন···তার নাম বলা আমার মানা··· পিপের শুভানুধ্যায়ী··সে চায় যে পিপ বড় হোক, ভালোভাবে মানুষ হোক। এই উদ্দেশ্যে সে টাকা দিয়েছে। পিপকে কামারশালার কাজ ছেড়ে এখন শহরে পড়াশোনা করতে যেতে হবে। একজন শিক্ষকের নাম আমি জানি। মিস্টার ম্যাথু পকেট····'

···নামটা আমারও চেনা। কারণ মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে একজন বলছিল—

'ম্যাথু মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন?'

এবং মিস হ্যাভিশ্যাম বলেছিলেন—

'আমি মরলে ও আসবে।'

এখন মিস্টার জ্যাগারস বলছেন—

'তাহলে পিপ ওঁর বাড়িতেই থাকবে। জো, পিপ তোমার কামারশালার কাজে আর তো কোন সাহায্য করবে না। তাই আমি ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা তোমায় দেব।'

জো আমার কাঁধে হাত রেখে বলে—

'পিপ যখন এ বাড়িতে এসেছিল, তখন ও ছোট্ট ছেলে। এখন ও আমার বন্ধুর মত। ও চলে যাবে ভেবে আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু ও বড় হবে, সুখী হবে, ভদ্রলোক

হবে: এটাই সুখের কথা। টাকা আমায় সুখ দিতে পারবে না।'

মিস্টার জ্যাগারস হয়তো ভাবছিলেন, জো কি বোকা। উনি বললেন, এক হপ্তা পরে আমায় লণ্ডনে যেতে হবে।

বিডি বললো, আমার সৌভাগ্যে সে খুশী। কিন্তু আমার মনে হল, আমি চলে যাচ্ছি বলে বিডি ও জো, দুজনেই দুঃখিত, পামবলচুক কাকা আমায় পছন্দ করে না, আমি জানি। কিন্তু এখন সেও ভালো ব্যবহার করলো। শুধু আমার অসুস্থ দিদি কিছু বুঝলো না। সে শুধু হাসলো।

মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে দেখা করলে উনি বললেন—'আমি সব জানি। মিস্টার জ্যাগারসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। বড় হও, ভাল হও। গুডবাই, পিপ।'

আমি হাঁটু গেড়ে বসে ওঁর হাতে চুমু খেলাম।

বিদায় নেবার সময় জোর গলা জড়িয়ে ধরে আমার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বিডি কাঁদছিল।

আমার এতোদিনের চেনা, একান্ত আপন এই গ্রাম ছেড়ে আমি অচেনা শহরে চলেছি। গাঁয়ের প্রান্তে সাইনপোস্টে হাত রেখে বললাম—

'হে বন্ধু, বিদায়!'

● বারো

আমার শিক্ষক মিস্টার ম্যাথু পকেটের ছেলে মিস্টার হারবার্ট পকেটের সঙ্গে আমার প্রথমে পরিচয় হল। এই সেই ভদ্রলোক, যার সঙ্গে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে আমার মারামারি হয়েছিল।

'তোমায় মেরেছিলাম বলে কিছু মনে করো না।'

কিন্তু আসলে আমিই তো ওকে মেরেছি। আমি মুখ খুললাম না।

হারবার্ট বললো—

'মিস হ্যাভিশ্যামের আমাকে পছন্দ হল না। পছন্দ হলে উনি এসটেলার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতেন।'

'তাই তোমার মন খারাপ?'

'না, ঠিক তা নয়। এসটেলা বড্ড অহংকারী। মিস হ্যাভিশ্যামের মত এসটেলাও কোন পুরুষকে পছন্দ করে না।'

পিপকে পথ দেখাচ্ছে এসটেলা

'এসটেলা কি হ্যাভিশ্যামের আত্মীয়া?'

'না, মেয়ের মত।'

'মিস হ্যাভিশ্যাম কোন পুরুষকেই পছন্দ করেন না কেন?'

'সে অনেক কথা। যখন উনি খুব ছোট্ট, ওঁর মা মারা গেলেন। বাপ খুব বড়লোক, দারুণ অহংকারী। ও আর একটা বিয়ে করেছিল, একটা ছেলেও হয়েছিল। এসব কথা ও মেয়ের কাছ থেকে গোপন রেখেছিল। সৎ ভাইয়ের কথা কিছুই জানতো না মিস হ্যাভিশ্যাম। ভদ্রলোকের দ্বিতীয়া স্ত্রী মারা গেলেন। ফলে সেই সৎ ভায়ের বাড়িতে আনা হল এবং মেয়ে সব কথা জানালো। মিস হ্যাভিশ্যামের সৎ ভাই ভীষণ পাজি। বাবা মারা যেতে পয়সা কড়ি সব উড়িয়ে দেয় ছোকরা। মিস হ্যাভিশ্যাম এক যুবককে ভালোবাসলেন। লোকটা খারাপ, আমার বাবা বলেছিলেন। মিস হ্যাভিশ্যাম সে কথা বিশ্বাস না করে আমার বাবাকে ওঁর বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন। সেদিন থেকে আমার বাবা আর ওঁর বাড়ি যান না। বিয়ের দিন ঠিক হল। বিয়ের পোশাক কেনা হল। অতিথিদের নিমন্ত্রণ জানান হল। কিন্তু বর উধাও। লোকটা ঠগ, আগেই বিয়ে করেছে।'

…লণ্ডনে হারবার্টের ভাড়া-করা ফ্ল্যাটের একটা ঘরেই

আমি থাকতাম। ওর বাবা আমাকে পড়াশোনায় মন দিতে বললেন।

● তেরো

মঙ্গলবার সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল জো।

'পিপ, তুমি কত বড় হয়ে গেছ! চেহারা ভালো হয়েছে! তুমি ভদ্রলোক হয়ে গেছ! তোমার দিদি ভালো আছে, বিডি খুব সাহায্য করে সার।'

'জো তুমি আমায় সার বলছো?'

'জো অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালো। বললো—মিস হ্যাভিশ্যাম ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এসটেলা বাড়ি ফিরেছে। সে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি তোমার দীর্ঘ জীবন ও ভালো স্বাস্থ্য কামনা করি। তুমি বড় হও, সার!'

'জো, এখনই যাচ্ছ কেন? ডিনার খেয়ে যাও—'

'না, পিপ। এই নতুন পোশাকে আমার আড়ষ্ট লাগে। কামারশালা, রান্নাঘর বা জলাভূমিতে আমায় মানায়। কামারশালার জানালা দিয়ে দেখা যাবে, জো লোহা পিটছে। সেই ভালো, পিপ। ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন।'

···পরের দিন সকালে আমি মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ি গেলাম।

দরজা খুলে দিল অরলিক!

ও এখন এ বাড়ির চাকর।

এসটেলা মিস হ্যাভিশ্যামের পাশে বসেছিল। মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন—

'এসটেলা, এখন ও বদলেছে, তাই না? ও ভদ্রলোক হয়েছে মনে হয়?'

এসটেলা হেসে ওঠে।

মিস্টার জ্যাগারস মিস হ্যভিশ্যামের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমায় বললেন—

'পিপ, এসটেলার সঙ্গে তোমার কতোদিনের পরিচয়?'

আমি একটু অবাক হলাম। বুঝলাম, এসটেলার সঙ্গে আমার মেলামেশা ওঁর পছন্দ নয়।

পরে আমি ওঁকে অরলিকের কথা বললাম।

'অরলিক লোকটা ভালো নয়।'

'ঠিক আছে, আমি পরে মিস হ্যাভিশ্যামকে বলবো।'

'ও ঝামেলা করতে পারে।'

'নাঃ, সাহস পাবে না।'

···সেদিন সন্ধ্যায় লণ্ডনে ফিরে আমি হারবারটকে বললাম, 'এসটেলাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু বড়লোক হতে না পারলে ওকে বিয়ে করার আশা করা যায় না।'

'আমরাও এক প্রেমিকা আছে। তার নাম ক্লারা। বড্ড গরীব। ওর বাবা জাহাজে কাজ করতো, এখন অসুস্থ।'

····পরের দিন এসটেলার চিঠি এল:

'পরশু দুপুরের কোচে লণ্ডন যাচ্ছি। মিস হ্যাভিশ্যাম তোমায় দেখা করতে বলেছেন।'

দেখা করতে ও জানালো, লণ্ডনের পশ্চিমে ন' মাইল দূরে রিচমণ্ডে এক মহিলার কাছে ও এখন থাকবে। তিনি ওকে পার্টিতে ও নাচের আসরে নিয়ে যাবেন। যাতে ও যুবকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় ও যোগ্য পাত্র বেছে নিতে পারে।

এসটেলাকে তখন আমার আরও সুন্দর মনে হয়। তবে, হয়তো, আগের মত অতোটা নিষ্ঠুর নয়।

● চৌদ্দ

তারপর এক সন্ধ্যায় চিঠি এল।

দুদিন আগে দিদি মারা গেছে। সোমবার ওর শেষকৃত্য হবে।

আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার দিদি আমার সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করেনি। কিন্তু এখন ওর মৃত্যুর খবর শুনে আমার দুঃখ হয়। হাজার হোক, আমার দিদি তো, নিজের মায়ের পেটের বোন—

আমার ধারণা, অরলিকই পেছন থেকে দিদির মাথায় আঘাত করেছিল। লোকটির শাস্তি হওয়া উচিত।

··· সোমবার সকালে দিদির শেষকৃত্যের পর আমি, বিডি ও জো রান্নাঘরে ডিনার খেলাম। কিন্তু আমি

ভদ্রলোক হয়ে গেছি বলে ওরা আমার সঙ্গে আর আগের মত মিশতে পারছে না।

ডিনারের পর কামারশালার বাইরে একটা বড় পাথরের ওপর জোর পাশে বসলাম। রাতে আমার পুরানো ছোট্ট ঘরটায় শোব শুনে জো খুশী হল।

বিডি বললো, অরলিক এখনও ওকে জ্বালাচ্ছে। শুনে আমার রাগ হয়।

বিডি তখন জো'র কথা বলে। জো বড্ড ভালোমানুষ। জোকে ওর বড় ভালো লাগে।

আমি বললাম—

'বিডি, আমি মাঝে মাঝেই এখানে আসবো। নাহলে জো-র বড্ড একা লাগবে।'

বিডি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—

'পিপ, তুমি সত্যিই আসবে?'

ও ঠিকই বলেছিল। আমি আমার কথা রাখিনি।

মিস হ্যাভিশ্যাম, পিপ, এসটেলা ও মিঃ জ্যাগার্স

·· একদিন সন্ধ্যাবেলা····

হারবার্টের ঘরে আমি একা। ও কয়েকদিনের জন্য ফ্রান্সে গেছে। বই পড়তে পড়তে রাত এগারোটা বাজলো।

হঠাৎ শুনলাম····

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ।

দরজা খুলতে ভেতরে এলো এক ভদ্রলোক। পরনে পুরু গরম পোশাক, যেন দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করে এসেছে। মাথায় দীঘল ও ধূসর চুল, চামড়ার রং বাদামী। লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি।

'মাস্টার, তুমি আমায় চিনতে পারছোনা?'

আমি চিনেছি!

সেই পলাতক কয়েদী!

'মাই বয়, তোমার করুণার কথা, সহৃদয়তার কথা আমি ভুলিনি।'

'কিন্তু এখন আমি তোমার আশ্রয় দিতে পারবোনা। গরম কিছু খাবে?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ। অনেক কয়েদীকে অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। তাদের সারা জীবন অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে হবে। তারা আর দেশে ফিরতে পারবেনা। আমি তাদেরই এক জন। অস্ট্রেলিয়ায় গেলে অনেক কয়েদীই বড়লোক হয়। এখন আমার অনেক টাকা।'

'শুনে খুব আনন্দ পেলাম।'

'তোমার ভাগ্য ফিরলো কি করে?'

'অচেনা কোন একজন আমায় পড়াশোনা করার জন্যে, বড় হবার জন্যে অর্থসাহায্য করেন—'

'বছরে কত টাকা পাও? আমি বলবো? প্রথম সংখ্যাটা পাঁচ—'

'তার মানে?'

'তোমার একজন অভিভাবক আছে। সে উকীল। তার নামের প্রথম অক্ষর জে—

আমি স্তম্ভিত।

এতোদিন ভেবেছিলাম, মিস হ্যাভিশ্যামই গোপনে আমায় অর্থসাহায্য করছেন। উনি নিশ্চয়ই চান যে এসটেলার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক।

আজ জানলাম, এসটেলা আমার জন্যে নয়।

আমায় সাহায্য করেছে এই পলাতক, নির্বাসিত কয়েদী।

'হ্যাঁ, পিপ, তুমি বড় হবে, ভদ্রলোক হবে। আমার সব

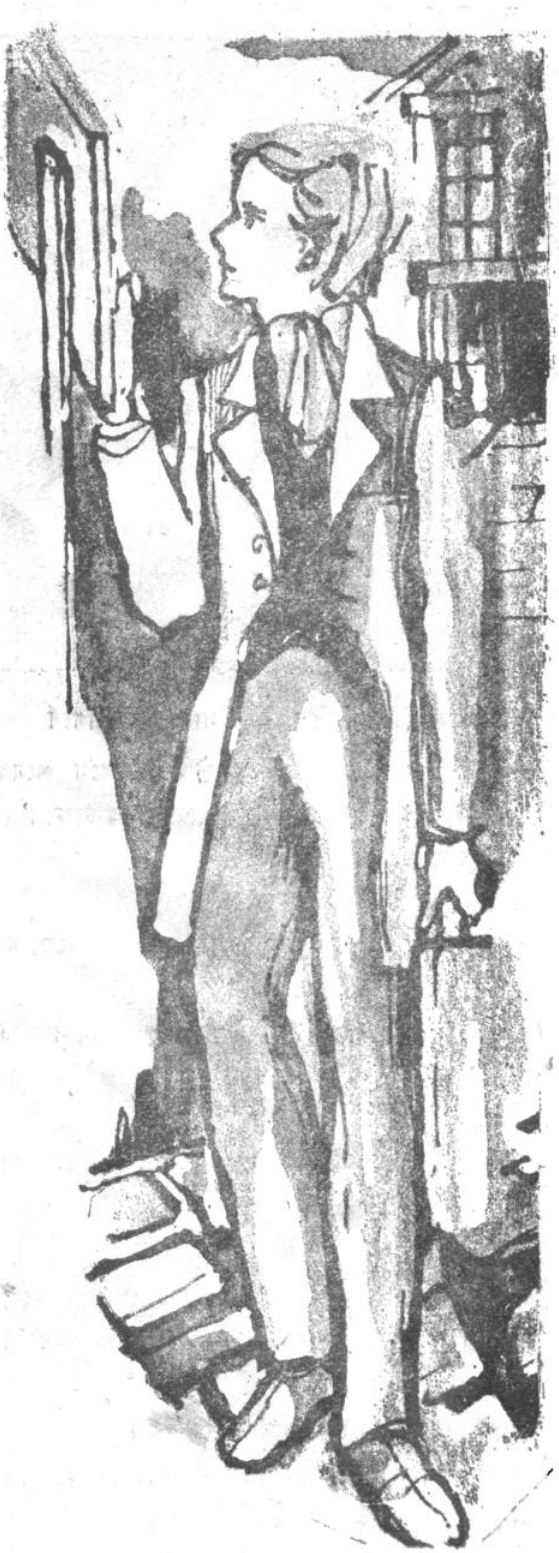

লণ্ডনে পিপ

টাকা তুমি পাবে। কথাটা উকীল মিস্টার জ্যাগার্স ছাড়া আর কেউ জানেনা। তুমি পলাতক ক্ষুধার্ত কয়েদীকে খাবার দিয়েছিলে। সেই কয়েদী আজ বড়লোক হয়েছে। সে তোমাকে বড় হতে সাহায্য করবে। অষ্ট্রেলিয়ায় আমার ভেড়ার ফার্ম আছে। আমি টাকা জমিয়েছি, সব টাকা তোমায় পাঠিয়েছি। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে অষ্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে অনেক কষ্টে এখানে এসেছি। আইনমত ওখানে আমার যাবজ্জীবন থাকার কথা। এ দেশে পুলিস আমার ধরতে পারলে আমার ফাঁসি হবে। আমার লুকিয়ে থাকার, ঘুমোবার একটা জায়গা চাই।'

'তোমার নাম কি ?'

'এখন আমার নাম প্রোভিস। আমার আসল নাম অ্যাবেল ম্যানউইচ।'

লোকটা মোটা একটা পকেটবুক টেবিলে রেখে বলে—

'এতে অনেক টাকার নোট আছে। এসব তোমার। তুমি খরচ করবে।'

'তুমি··· তোমাকে আমি কতোদিন লুকিয়ে রাখতে পারবো ?'

'কেউ পুলিসে খবর না দিলে কোন ভয় নেই। উকীল জ্যাগার্স, উকীলের কেরানী আর তুমি : এ ছাড়া আর কেউ জানেইনা, আমি এখানে।'

'তুমি কতোদিন ইংল্যাণ্ডে থাকতে চাও ?'

'মরার আগে আমি আর অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরবো না।'

● পনের

কাছাকাছি একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া করে প্রভিসকে সেখানে রাখলাম। আমি মিস্টার জ্যাগার্সের সঙ্গে দেখা করতে উনি বললেন—'আমার কাছে কারো নাম বোলোনা।'

অর্থাৎ, আইনজীবী জ্যাগার্সকে কেউ যদি বলে, আসামী প্রভিস ইংল্যাণ্ডে ফিরেছে, আইনতঃ তাঁকে পুলিসে খবর দিতে হবে।

'ও যা বলছে সব সত্যি ? আমি তো ভেবেছিলাম যে মিস হ্যাভিশ্যামই আমায় অর্থসাহায্য করছেন—'

'তা তো আমি বলিনি। ও যা বলছে, তাই ঠিক।'

দু-তিনদিন পরে····

চেয়ারে বসে দুলছি আমি। প্রভিস ঘুমুচ্ছে। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে প্রভিস লাফিয়ে উঠলো। ওর হাতে একটা ছোরা।

দরজা খুলে আমি বললাম—

'ভয়ের কিছু নেই। আমার বন্ধু হারবারট—'

হারবারট বন্ধু শুনে ছোরাটা লুকিয়ে রাখলো প্রভিস।

প্রভিস আমায় ও হারবারটকে তার জীবনের কাহিনী শোনালো।

'শোনো বন্ধুরা, আমি যখন ছোট্ট ছেলে, তখন থেকে আমায় খাবার চুরি করে বাঁচতে হত। ভিক্ষে নয়তো চুরি। কাজ পেলে কাজ। এমনি করে বড় হলাম।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে কমপিসন নামের এক পেশাদার ক্রিমিনালের পাল্লায় পড়লাম। তুমি তাকে দেখেছো, পিপ। যার সঙ্গে জলাভূমিতে আমি লড়ছিলাম, যাকে পুলিস অ্যারেস্ট করলো।

কমপিসনের নির্দেশে আমি নানা অপরাধ করি। পুলিস দুজনকেই ধরে। কিন্তু আইনের চোখে আমারই অপরাধ বেশী। তাই ওর হল সাত বছর জেল, আমার চৌদ্দ বছর। আমাদের প্রিজন-শিপে বন্দী রাখা হল।

আমি কমপিসনকে খুন করতে চেয়েছিলাম। তার ফলে আমায় পাঠানো হল জাহাজের ব্ল্যাকহোলে। সেখান থেকে পালিয়ে সাঁতার কেটে আমি জলাভূমিতে আমি। আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে ভেবে কমপিসনও পালিয়ে সাঁতার কেটে ওই জলাভূমিতে আসে। আমিই ওকে সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দিই।

কিন্তু এবারও আমার শাস্তি বেশী হল। আমায় ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হল। বিচারকের নির্দেশ, সারা জীবন আমায় অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে হবে। আমি লুকিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছি।

কমপিসন কোথায় আমি জানিনা। তবে লোকটা আমার শত্রু।'

মিস্টার পকেট-এর কাছে আমি ছাড়া আর একজন ছাত্র ছিল। তার নাম ড্রামি। আমার সঙ্গে ওর বনিবনা

লণ্ডনে পিপ ও এসটেলা

ছিলনা। জো-র সঙ্গে দেখা করতে যেয়ে হোটেলে উঠলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, ড্রামিও ওখানে। দুজনে এমন ভাব করলাম যেন কেউ কাউকে চিনিনা।

এসটেলা ও মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে দেখা হল।

ওরা জানাল, এসটেলার সঙ্গে ড্রামি-র বিয়ে হবে।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মধ্যরাতের কিছু পরে লণ্ডন ব্রিজ পেরিয়ে আমি আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে চলেছি। দারোয়ান আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিল। মিস্টার ওয়েসিক লিখেছেন—

'বাড়ি যেওনা।'

সকালে মিস্টার ওয়েসিকের সঙ্গে দেখা করলাম। রাতটা কাটিয়েছি হোটেলে।

'কেউ কেউ জেনে গেছে যে ওই লোকটা অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে এখানে এসেছে। ওদের ধারণা, লোকটা তোমার কাছে আসবে। তাই ওরা তোমার ফ্ল্যাটের ওপর নজর রেখেছে।'

'কে এসব করছে?'

'আমি বলবোনা।'

'কমপিসন নামের সেই লোকটা কি এখন লণ্ডনে?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন মিস্টার ওয়েসিক।

এর আগেই হারবারট জানিয়েছে, এই শয়তান কমপিসনই এককালে মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিল।

মিস্টার ওয়েসিক আমায় ওঁর পরিকল্পনার কথা শোনালেন —'হারবারটের মতে ওর প্রেমিকা মিস ক্লারার বাড়িতে ওই লোকটাকে রাখা যেতে পারে। প্রথমতঃ, ওই বাড়ি তোমার ফ্ল্যাট থেকে এতো দূরে যে কেউ ওখানে তোমায় খুঁজবে বলে মনে হয়না। দ্বিতীয়তঃ, তোমার ওখানে যেতে হবেনা, হারবারট সব খবর আনবে। তৃতীয়তঃ, ওই বাড়ি নদীর কাছে। সুতরাং ওখান থেকে ওই লোকটাকে এখন জাহাজে তুলে দেওয়া সহজ হবে। হারবারটের কথামত ওই লোকটাকে এখন ক্লারার বাড়িতেই রাখা হয়েছে। তবে রাত্রে ছাড়া তোমার পক্ষে নিজের ফ্ল্যাটে না থাকাই এখন ভালো।'

সন্ধ্যে ৮টা নাগাদ ক্লারার বাড়ি গেলাম। হারবারট ওখানেই ছিল। প্রভিসকে একেবারে চিলেকোটার এক ঘরে রাখা হয়েছে। ঘরের জানালা দিয়ে নদী দেখা যায়।

প্রভিসকে বোঝালাম, খুব তাড়াতাড়ি ওকে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যেতে হবে।

হারবারটের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হল যে আমরা

পিপ ও প্রভিস

দুজনে দাঁড় টানবো, নৌকোর ভেতরে থাকবে প্রভিস।

একটা নৌকো জোগাড় হল। রোজ নদীর বুকে আমি ও হারবারট নৌকোর দাঁড় টানতাম। যাতে প্রভিসকে নিয়ে পালাবার সময় কেউ সন্দেহ না করে।

পরে হারবারট প্রস্তাব দিল যে আমাদের সঙ্গে নৌকোর দাঁড় বাইবার জন্যে থাকবে মিস্টার পকেটের আর এক ছাত্র স্টারটপ। তার সঙ্গে আমাদের ভাব আছে। তবে এখন তাকে কিছু বলা হবেনা।

আমাদের পরিকল্পনাটা ছিল এইরকম :

আমাদের নৌকো প্রভিসকে নদী থেকে সমুদ্রে নিয়ে যাবে। সেখানে যে কোন স্টীমশিপে আমি ও প্রভিস উঠবো। বুধবার সকালে আমরা প্রভিসকে নৌকায় ওঠাবো।

কিন্তু সে রাতে বাড়ি ফিরে নোংরা কাগজে লেখা একটা চিঠি পেলাম—

'আজ বা কাল রাত নটায় তুমি তোমার পুরোনোদিনের চেনা জলাভূমির ধারে ছোট্ট বাড়িটায় অবশ্যই একা এসো, আমরা তোমার প্রভিস কাকা সম্বন্ধে কিছু জানি।'

হারবারটকে একটা চিঠি লিখে আমি কোচে উঠলাম। হোটেলে ডিনার সেরে আমি যথাসময়ে জলাভূমির ধারে ছোট্ট, অন্ধকার বাড়িটার দিকে পা বাড়ালাম।

দরজা খোলা। ভেতরে টেবিল, বিছানা। সিঁড়ির ওপরে একটা ঘর।

'কে আছ?'

কেউ জবাব দিলনা।

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। ভেতরে মোমের আলো। দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, কাছেপিঠে মানুষ না থাকলে আলো কে জ্বালালো?

হঠাৎ····

আলো নিভে গেল!

দড়ির একটা ফাঁস আমরা গলার চারপাশে চেপে বসলো। শক্ত একটা হাত আমার মুখ চেপে ধরলো। তারপর কে আমায় দেয়ালের সঙ্গে বেঁধে মোমের আলো জ্বাললো।

আমি দেখলাম···

আততায়ী অরলিক!

'অরলিক, আমায় যেতে দাও!'

'তুমি আমার শত্রু! এই পিস্তলটা দেখেছো? তোমার জন্যে···হ্যাঁ, তোমারই কথা শুনে বিডি আমায় ঘেন্না করে। অথচ আমি ওকে ভালোবাসতাম।'

'তোমার খারাপ ব্যবহারের জন্যে সে তোমায় অপছন্দ করে।'

'তোমার জন্যে আমার চাকরি গেছে। তোমার জন্যে আমি জোর হাতে মার খেয়েছি। তুমি ছুটি পেলে, আমি মার খেলাম। তাই আমি পেছন থেকে তোমার দিদির মাথায় মেরেছিলাম। তোমার দিদি মরেছে। এবার তুমিও মরবে।'

ওর চোখদুটো লাল। ও মদ খাচ্ছে। ও বলে—

'প্রভিসও বাঁচবেনা। প্রভিসের ওপর নজর রেখেছে কমপিসন। প্রভিস মরবে।'

এখন অরলিকের হাতে মস্ত বড় পাথরের ভারী হাতুড়ি। ও হাতুড়ি তুলতেই আমি চেঁচিয়ে উঠি। আলো হাতে লোকজন ছুটে এল। অনেকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে অন্ধকারে পালালো অরলিক। ততোক্ষণে আমি জ্ঞান হারিয়েছি।

আসলে অরলিকের চিঠি আমার ঘরে পেয়ে হারবারট আমায় বাঁচাতে লোকজন নিয়ে এসেছিল।

● সতেরো

বৃহস্পতিবার সকালে হামবুর্গ ও রটেনড্যামগামী দুটো স্টীমবোট লণ্ডন থেকে যাত্রা করবে। ওদুটোর যে কোনটার ক্যাপ্টেন আমাদের নিতে রাজী হবে কিনা,সেটাই প্রশ্ন।

রাতটা আমরা কাটালাম এক সরাইখানায়।

প্রভিস বলছিল—

'জেলে বা প্রিজনশিপে দেয়ালের মধ্যে বন্দী ছিলাম। আজ আমি মুক্ত, স্বাধীন। জেলে না থাকলে স্বাধীনতার মূল্য বোঝা যায় না।'

পরের দিন সকালে আমি, হারবারট, স্টারটপ এবং প্রভিস নৌকায় উঠলাম। যেখান দিয়ে স্টীমশিপ যাবে, তার কাছাকাছি পৌছুলাম।

আধঘণ্টা পরে স্টীমশিপের ধোঁয়া দেখা গেল। তার পেছনে

পিপ, হারবাট ও প্রভিস

আর একটা স্টীমশিপের ধোঁয়া।

হঠাৎ দেখলাম, দ্রুতগামী একটা বোটও আমাদের দিকে ছুটে আসছে। বোট থেকে চেঁচিয়ে একজন বললো—

'তোমাদের সঙ্গে আছে পলাতক কয়েদী অ্যাবেল ম্যান-উইচ, অন্য নাম প্রভিস। সে অস্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে।'

হঠাৎ বোটটা সরাসরি আমাদের নৌকোটায় ধাক্কা দিল। ওদিকে স্টীমশিপও এগিয়ে আসছে। এঞ্জিন বন্ধ করার অর্ডার দিল কে একজন কিন্তু ততোক্ষণে স্টীমশিপ বড্ড কাছে এসে গেছে।

অন্য বোটটা যে চালাচ্ছিল সে প্রভিসের কাঁধ ধরতে গেল। লোকটা কমপিসন!

নদীতে পড়ে গেল কমপিসন, তারপর প্রভিস। আমাদের নৌকো ডুবে গেছে। একটু পরে প্রভিস মাথা তুললো। কমপিসনকে খুঁজেই পাওয়া গেলনা। এই সেই কমপিসনের নিয়তি, যে মিস হ্যাভিশ্যামকে ঠকিয়ে ছিল আর প্রভিসকে পাপের রাস্তায় নিয়ে এসেছিল!

বোটে পুলিসের লোকজন ছিল। তারা প্রভিসকে শেকলে বাঁধলো।

প্রভিস বলছিল—

'আমার দুঃখ নেই। তুমি বড় হবে। আমার সব টাকা তুমি পাবে।

কিন্তু প্রভিস জানেনা যে আইন ভেঙে ইংল্যাণ্ডে ফেরার অপরাধে ওর সব টাকা বাজেয়াপ্ত হবে সরকারী খাতে। সুতরাং আমি কিছুই পাবনা।

কথাটা ওকে বলিনি।

● আঠার

কায়রোয় চাকরি পেয়েছে হারবারট। কেরানীর চাকরি। ওকে বিদায় জানালাম।

ওদিকে প্রভিস জেলে খুব অসুস্থ। ওর বিচারও হল। বিচারক বললেন, প্রভিস যদিও অস্ট্রেলিয়ায় সৎভাবে থেকে জীবনে সফল হয়েছিল, বিনা অনুমতিতে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসার অপরাধে তার ফাঁসি হবে।

কিন্তু তার আগেই ঘনিয়ে এলো মৃত্যুমুহূর্ত।

'একদিন আমায় দেখে তুমি ভয় পেতে, পিপ্। আজ তুমি আমায় ভয় পাওনা। তাই আমি সুখী। মরতে আমার দুঃখ নেই।'

আমার হাতে ঠোঁট ছোঁয়াতে যায় প্রভিস।

তারপর তার হাত আমার হাত ছোঁয়।

শিথিল হাত।

প্রভিস মরে গেছে।

.....এর পরই আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। জো খবর পেয়ে ছুটে এল। ওর সেবাযত্নে আমি ভালো হয়ে উঠলাম। ভালো হয়ে জোর মুখে শুনলাম, মিস হ্যাভিশ্যাম মারা গেছেন। মরার আগে উনি উইল বদলে ছিলেন। বেশীর ভাগ টাকা পেয়েছে এসটেলা।

তবে আমার শিক্ষক ও ওঁর এককালের বন্ধু মিস্টার ম্যাথু পকেটকেও উনি চার হাজার পাউণ্ড দিয়ে গেছেন।

পিপের গলায় ফাঁস লাগিয়েছে অরলিক

অরলিক ধরা পড়েছে। ওর জেল হয়েছে।

কিছুটা সুস্থ হয়ে আমি গাঁয়ের বাড়িতে গেলাম। বিডি ভালো পোশাক পরেছে। কথাটা তাকে বলতে সে বললো—'আজ আমার বিয়ের দিন। জোর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।'

'বিডি, তোমার স্বামী এতো ভালো, এতো দয়ালু! কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি বলে আমায় ক্ষমা করো।'

সব জিনিস বেচে আমি কায়রোয় হারবারটের কাছে গেলাম। আমি কেরানীর চাকরি পেলাম। হারবার্ট তখন সুখী। ও ক্লারাকে বিয়ে করেছে।

...এগারো বছর পর আমি ইংল্যাণ্ডে ফিরলাম।

সেই পুরোনো গাঁয়ের বাড়ি। রান্নাঘরে আগুনের পাশে বসে পাইপ খাচ্ছে জো। তামাম চুলে তার পাক ধরেছে। পাশে ছোট্ট চেয়ারে বসে আছে ওর ছোট্ট ছেলে।

'পিপ্, আমার ছেলের নাম রেখেছি পিপ্। বড় হলে তোমার মত হবে।'

...সন্ধ্যাবেলা মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ি গেলাম।

এসটেলার সঙ্গে দেখা হল।

ওর স্বামী মারা গেছে।

'পিপ্, তোমার কথা আমি প্রায়ই ভাবি।'

'আমিও।'

'বাড়িটা আমি বেচে দিচ্ছি। এই জায়গাটাকে বিদায় জানাবো কিন্তু তোমাকে নয়। তুমি কি আবার বিদেশে যাবে?'

'তোমাকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগে।'

'গতবার তা মনে হয়নি। বলো, আগের মত এখনও আমরা বন্ধুতো?'

'আমরা বন্ধু।'

'আমরা দূরে গেলেও বন্ধু থাকবো।'

কিন্তু আমাকে আর এসটেলাকে ছেড়ে দূরে যেতে হয়নি। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।

বিষাক্ত ওষুধ রহস্য / অমিতাভ সেন

বিখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডন জাপকে'ওয়াম'-এর সদর ঘাঁটিতে আনা হয়েছে।

এদের সব আছে—পুলিশ, শ্রমিক-বাহিনী, পরিবহণ ব্যবস্থা—সভ্য মানব সমাজের মতন-ই।

একদিন হয়তো পিঁপড়েরাই মানবজাতির প্রভু হয়ে বসবে। আমার ওষুধ তা হতে দেবে না।

চরম বিশৃঙ্খলা! কিন্তু মানুষকে খাওয়াবো কেন? সারা পৃথিবীর পিঁপড়ে কলোনীকে খাওয়াতে পারবো।

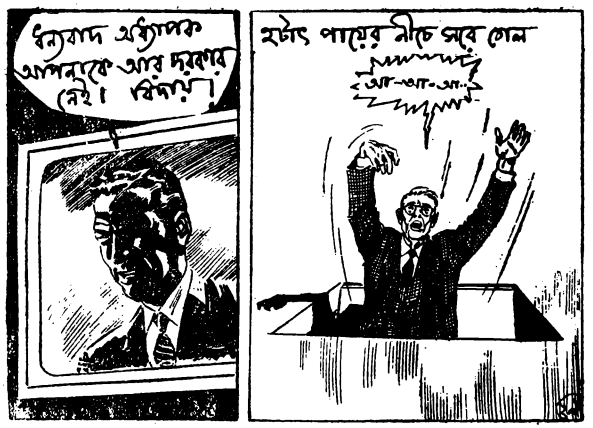

পায়ের নীচে মেঝে ফাঁক হয়ে গেল।
একটা আর্তনাদ।

ল্যাবরেটরি থেকে ওষুধটা নিয়ে এসে পানীয়ের
সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

শিকাগোয় লেম-ও কারখানার বিস্তৃতি একশ একর।
প্রতিদিন লরি বোঝাই করে লেম-ও চালান
হয় সারা পৃথিবীতে।

ওয়াম-এর নির্দেশে কয়েকদিন পরে একটা কালো
গাড়ি লেম-ও কারখানায় এসে থামলো।

[চলবে]

একটু হাসো!.....!

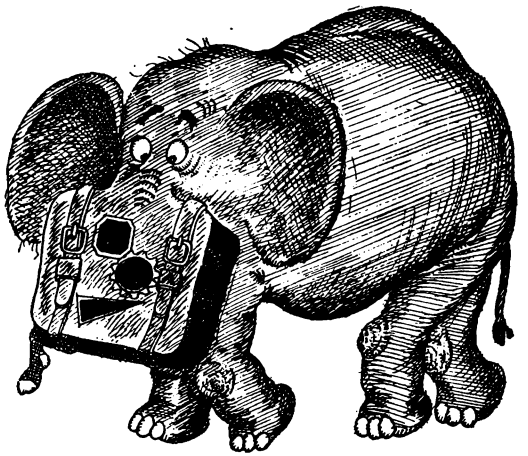

বোকা প্রশ্ন করে—হাতির নাকের বদলে 'ট্রাঙ্ক' (শুঁড়) থাকে কেন?

চটপট জবাব—তাহলে কি সুটকেস বয়ে নিয়ে বেড়াবে?

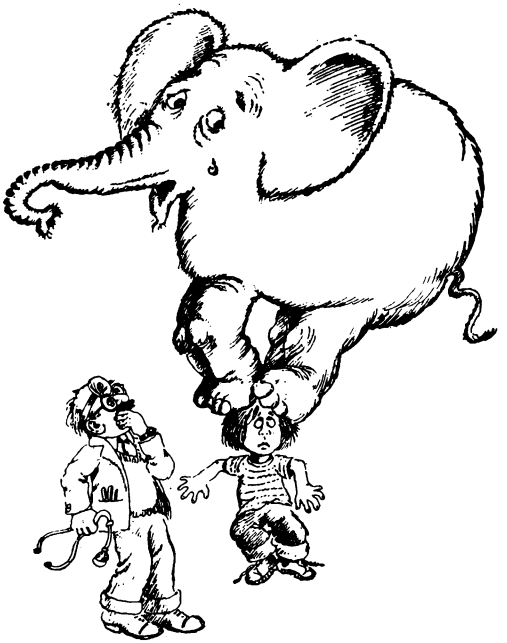

একটি ছোট ছেলে ডাক্তারের কাছে এসেছে, তার মাথার ওপর বিশাল হাতি।

ডাক্তার বলে—তুমি তো খুব বিপদে পড়েছ?

হাতি বলে—ও ছোকরা নয়, বিপদ আমার। পায়ের তল থেকে ছোঁড়াটাকে সরিয়ে নিন্ তো!

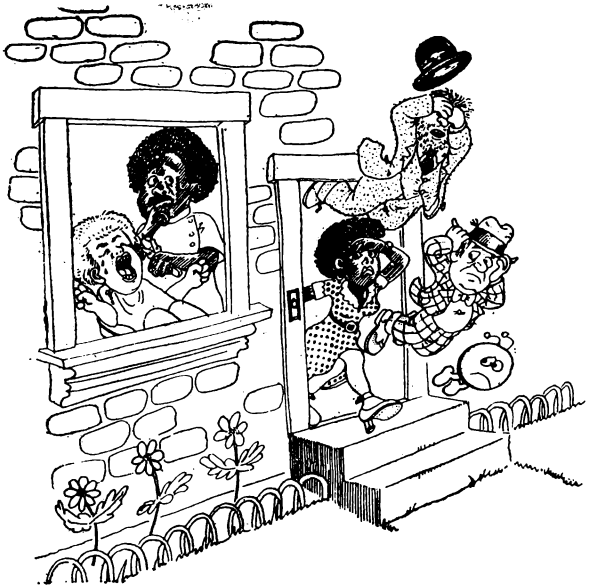

দাঁতের ডাক্তারের টেলিফোন—অপর প্রান্তে এক মহিলা!
—ব্যাপার কি। খোকার দাঁত তুলতে ৪০ টাকা বিল পাঠিয়েছেন। আগে তো ১০ টাকা ছিল।
—হাঁ। আপনার ছেলের বিকট চিৎকারে আমার তিনজন রুগী পালিয়ে গেছে।

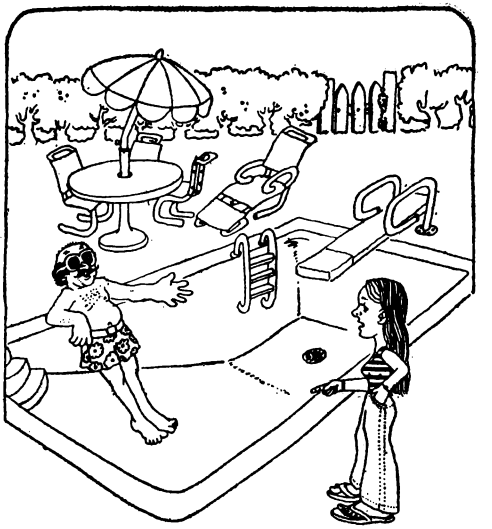

প্রতিবেশিনীকে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক—আমার সুইমিং পুল কেমন হয়েছে!
—খুবই ভালো। কিন্তু পুলে জল নেই কেন?
—সহজ কথা! আমি সাঁতার কাটতে জানি না।

বৃদ্ধের বয়স ৯৯ বছর। সাক্ষাতকার শেষ হলে সাংবাদিক বলে—এক বছর হলেই আপনার ১০০ বছর পূর্ণ হবে। তখন আবার আসবো।
বৃদ্ধ বলে—না আসার কারণ তো দেখি না। তুমি তো বেশ গাঁট্টা গোট্টা, ভালই স্বাস্থ্য। একটা বছর নিশ্চয়ই বাঁচবে!

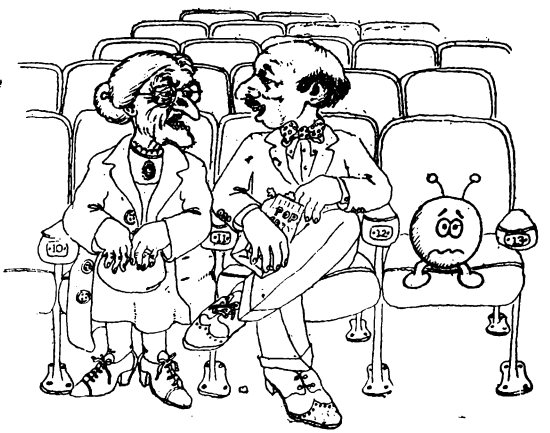

সিনেমা হল। ভদ্রলোক বাইরে থেকে ফিরে এসে পাশের সীটের ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন—বাইরে যাবার সময় পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম কি?
ভদ্রমহিলা (রাগতস্বরে)—হাঁ—ছোটলোক!
ভদ্রলোক—যাক, তাহলে নিজের সীটেই ফিরে এসেছি।

মনেরেখো

সোহিনী পাল

ভারতে মোট পোস্ট অফিসের সংখ্যা কত ?

১,২৫, ২৮৩টি। এর মধ্যে ২০, ৮৭০টি পোস্ট অফিস থেকে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা আছে। (১৯৭৮ পর্যন্ত)

পিনকোড (PIN) কি ?

সুষ্ঠুভাবে ডাক চলাচল ও বিলির জন্য ১৯৭২ থেকে ভারতে Postal Index Number (PIN) কোড চালু করা হয়। এই কোড-এ ছয়টি সংখ্যা আছে। প্রথম সংখ্যাটি অঞ্চল (region), দ্বিতীয় সংখ্যাটি উপ-অঞ্চল (Sub-region) এবং প্রথম তিনটি একত্রে Central sorting district বোঝায়। শেষ তিনটি সংখ্যা এই sorting district-এর অধীন নির্দিষ্ট delivery পোস্ট অফিসকে নির্দেশ করে।

ভারতের রাজনৈতিক দল সমূহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। ১৮৮৫ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী। পরাধীন ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মচেতনা ও স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জাগ্রত করবার জন্য এই মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয়। অহিংসা, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন—এই প্রচেষ্টার প্রধান অঙ্গ ছিল। স্বাধীন ভারতে এই রাজনৈতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে পরিচালিত ছিল এবং দেশের শাসনভার এই দলের উপরই ন্যস্ত ছিল। ১৯৬৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের এক অংশ মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে সংগঠন কংগ্রেস নামে নূতন দল গঠন করে। ১৯৭৮ সালে ইন্দিরা সমর্থিত কংগ্রেস আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়: একটির সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি—১৯২৪ সালে প্রথম সংগঠিত হয়। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী এই দল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার অনুসৃত নীতিই এই দল সমর্থন করে থাকেন। মার্কস ও লেনিনের আদর্শ অনুসরণ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই এঁদের উদ্দেশ্য।

কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী): ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে একটি দল বেরিয়ে এসে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দল গঠন করেন। এই দল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী, এই দল থেকে একটি গোষ্ঠী বেরিয়ে গিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (মার্কসিস্ট ও লেনিনিস্ট) গঠন করেন।

ফরোয়ার্ড ব্লক—১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বের হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু এই দল গঠন করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে একদিন এই দলের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৯৭৮ সালের ২৩শে জানুআরি নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে সমর গুহর একান্ত প্রচেষ্টায় নেতাজীর প্রতিকৃতি পার্লামেন্টের সভাকক্ষে স্থান পায় এবং দলমত নির্বিশেষে সকলে নেতাজীকে জাতীয় নেতা হিসাবে স্বীকার করেন। ফলে এই দলের হৃত গৌরব আবার অনেকাংশে ফিরে আসে।

মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক—১৯৫০ সালে ২৩শে জানুআরি কিছু সংখ্যক সদস্য মূল ফরোয়ার্ড ব্লক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দল গঠন করেন। পাঞ্জাবের দেশসেবক পার্টি বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত

হয়েছে।

আকালী দল—শিখদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই দল গঠন করা হয়।

রেভেলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি (আর. এস. পি.) মার্কসীয় আদর্শে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই দল গঠন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই দলের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগ্রাম (ডি. এম. কে.)—দাক্ষিণাত্যের তপশীলী সম্প্রদায় এই দল গঠন করেন। ১৯৬৭ এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনে এই দল তামিলনাড়ু রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

এ. আই. এ. ডি. এম. কে.—ডি. এম. কে. হইতে শ্রী এম. জি. রামচন্দ্রনের নেতৃত্বে কিছু লোক এই দল গঠন করেন। এই দলই বর্তমানে তামিলনাড়ুর শাসকদল।

জনতা পার্টি—১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জানুআরি জনসংঘ, আদি কংগ্রেস, সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টি ও ভারতীয় ক্রান্তদল মিলিত হয়ে জনতা পার্টি গঠন করে।

লোকদল—১৯৭৯-র ২৬শে সেপ্টেম্বর চরণ সিং "লোকদল" নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। রাজনারায়ণের জনতা (এস), মধু লিমায়া ও জর্জ ফার্নাণ্ডেজ চালিত সোসালিস্ট গোষ্ঠী এবং বিজু পট্টনায়কের নেতৃত্বাধীনে উপদল নিয়ে 'লোকদল' গঠিত হয়। জানুআরির (১৯৮০) লোকসভা নির্বাচনে এই দল বিহার ও উত্তর প্রদেশে কিছুটা সাফল্য লাভ করে।

ভারতীয় জনতা পার্টি—জনতা পার্টির জনসংঘ গোষ্ঠীর সভ্যগণ ১৯৮০-র ৬ই এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টি নামে একটি নতুন দল গড়লেন। দলের চেয়ারম্যান হলেন শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ী। ডঃ সুব্রাহ্মণম স্বামী, এম. পি. ছাড়া আর সব প্রাক্তন নেতাই এই দলে যোগ দেন।

With best Compliments of :

Phone : { Factory : 66-5764
City Offi: 23-8737

RELIANCE INDUSTRIES

EVERYTHING IN DIE CASTING

Factory :
27, Rabindra Sarani
Lilooah, (West Bengal)

City Office :
40-B, Princep Street
2nd Floor, Calcutta-700072

With best compliments from

GELCOR

Electrical Engineers & Engineering Consultants.
Electrical Fans
EXHAUST ● INDUSTRIAL CEILING ● PORTABLE
Good will Electrical Corporation
3/25, R. B. Road, Calcutta-34

ত্বকের সমস্যা? বোরোলীন ভরসা!

পঞ্চাশ বছর ধরে বোরোলীন সকলের বিশ্বাস রেখে এসেছে। কারণ, আপনার ত্বকের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র বোরোলীন।

সব ঋতুতে প্রতিদিন মাখুন বোরোলীন। এতে গা-হাত-পা ফাটা ও খসখসে ভাব দূর হয় এবং ত্বক থাকে সুস্থ, সতেজ, কোমল। সাধারণ কাটা-ছড়াতেও অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে বোরোলীন দারুণ কাজ করে।

সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

কোমল পরিচর্যাকারী ক্রীম

MFG-GDP-4441-1

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৮৮

With best compliments of :

Lord Plastic & Glass Works (P) Ltd.

28, Rishi Bankim Road

Calcutta-700034

'এ যেন এলেম নতুন দেশে'
শীতের দার্জিলিঙ

গ্রীষ্মের বা শরতের দার্জিলিঙের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় বেশী। কিন্তু এসময়কার দার্জিলিঙ অভিনব। এখন আবহাওয়া চমৎকার। ঝরঝরে আকাশ, বৃষ্টি নেই—কুয়াশাও নেই বললেই চলে। রোদ ঝলমল পরিবেশে দৃষ্টি চলে অবাধে—বহুদূর। তারই মাঝে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠবে কাঞ্চনজংঘার মহিমময়ী রূপ।

শুধু কাঞ্চনজংঘা কেন? দার্জিলিঙ থেকে এই সময় পৃথিবীর সেরা আরও কয়েকটি পর্বতশিখরও আপনি দেখতে পাবেন।

এখন লোকের ভাড়ও কম। শান্ত, নির্জন পরিবেশে মন হয়ে উঠবে স্নিগ্ধ প্রশান্ত।

নিরুত্তাপ রোদ, হিমেল বাতাস! শীতের পোষাকে চলাফেরার কোন অসুবিধাই বোধ করবেন না।

দার্জিলিঙে আছে কয়েকটি ট্যুরিস্ট লজ। উপরন্তু এসময়ে সেখানে শীতকালীন কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।

পাহাড় এবং অরণ্য যাঁদের বার বার হাতছানি দেয়, সেইসব প্রকৃতপ্রেমিকদের কাছে এসময়কার দার্জিলিঙ ভ্রমণ এক সুমধুর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। অনেক, অনেক দিন। আজই আসুন। শীতের কটা দিন দার্জিলিঙ ও কালিম্পঙে কাটিয়ে যান। দেখুন, ছুটির মজা বলে কাকে।

বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয় বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট)

কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

অথবা দার্জিলিঙ

ফোন : ২০৫০ গ্রাম : DARTOUR

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

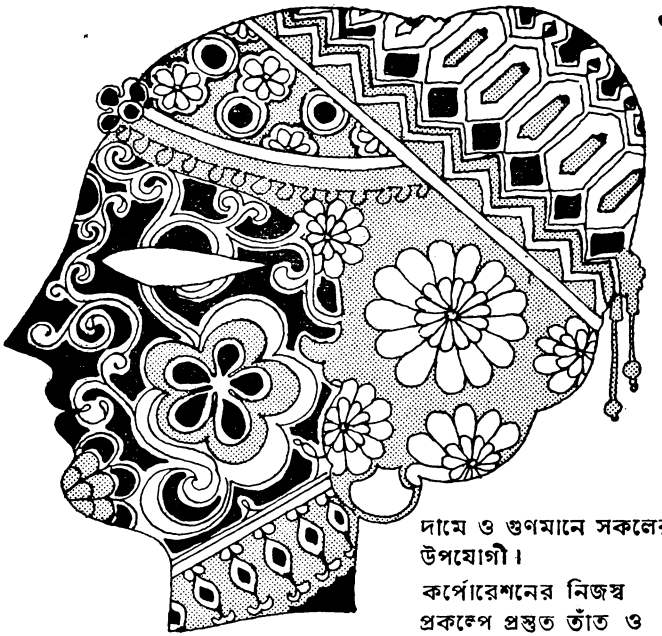

'তন্তুশ্রী র' সম্ভারে
আপনার উৎসবের
দিনগুলি রঙীন করে তুলুন

তন্তুশ্রী

আপনার নিকটবর্তী বিক্রয়কেন্দ্রে
খোঁজ করুন

দামে ও গুণমানে সকলের
উপযোগী।
কর্পোরেশনের নিজস্ব
প্রকল্পে প্রস্তুত তাঁত ও
রেশম বস্ত্রের বিচিত্র
সমারোহ।

**ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড
পাওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিঃ**
(পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

স্নিগ্ধ হাওয়ার জন্যে শ্রেষ্ঠ—

সুপ্রীম ফ্যান

সোহিনী মানেই ভালো বই

কিশোরদের জন্য রহস্য গল্পের অনবদ্য সংকলন

রহস্য বিচিত্রা ১০.০০

লিখেছেন : হেমেন্দ্র রায়/নীহাররঞ্জন/প্রেমেন্দ্র মিত্র/ হরিনারায়ণ/জরাসন্ধ/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

সম্পাদনা : মহেন্দ্র বসু

'রহস্য বিচিত্রা'র নতুন পেপার ব্যাক সংস্করণ : ৬.০০ মাত্র।

ছড়ার আশ্চর্য বই

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের

ফুলঝুরি ৬.০০

ছড়া নয়তো যেন ছড়ানো সোনা! পাতায় পাতায় রঙিন ছবি। তিন রঙা প্রচ্ছদ।

অলঙ্করণ / সুনীল শীল

ছোটদের জন্য বিদেশী ক্লাসিকের ভাষান্তর

'বিশ্ববিচিত্রা' সিরিজ

প্রতিটি বই ৩.০০। পাতায় পাতায় রঙিন ছবি

জুলে ভার্ন, ড্রাকুলা

ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড, ব্রুস, আমার ব্রুস, কাট্টি অফ দ্য ব্লাইণ্ড, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, রবিনসন ক্রুশো এবং কিং সলোমনস্ মাইনস ৩.৫০

ফেলুদা—৬.০০

সোহিনী প্রকাশনী

২৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড। কলকাতা-১

ফোন : ২২ ২৭৭০

চিলড্রেন্স্ ডিটেক্‌টিভ্

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম ও সুযোগ

● বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা। অগ্রিম মনিঅর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ব্যাঙ্কড্রাফট বা ক্রশ চেকে পাঠাবেন। CHILDRENS DETECTIVE নামে। কলকাতার বাইরের চেক নেওয়া হয় না।

● গ্রাহকদের ভিপিতে পত্রিকা না নেওয়াই ভালো—খরচ বেশী পড়ে, টাকা নিয়ে গোলমাল হয় পোস্ট অপিসে।

● রেজিস্টার্ড ডাকে পত্রিকা নিতে হলে বছরে ২০ বেশী লাগে। অফিস থেকে হাতে করে পত্রিকা নিতে হলে সেকথা আগে জানিয়ে দিতে হয় এবং প্রতি ইংরেজী মাসের ১০ তারিখ নাগাদ চাঁদার রসিদ দেখিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ করতে হয়।

● ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ১৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে লিখিতভাবে P. M. G, W. B. Circle, Calcutta-1 ঠিকানায় অভিযোগপত্র পাঠিয়ে তার অনুলিপি পত্রিকা অফিসে পাঠাবেন। তাহলে আর এক কপি পত্রিকা দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

● গ্রাহক হলে বিশেষ সংখ্যা, পূজা সংখ্যা, বড়দিন সংখ্যা, প্রভৃতির জন্য বেশী দাম দিতে হয়।

এজেণ্ট হওয়ার নিয়ম

● চিলড্রেন্স ডিটেক্‌টিভ পত্রিকার এজেণ্ট হতে হলে ১০ টাকা জমা রাখতে হয়। এক মাস আগে জানিয়ে এজেন্সী ছাড়লে ঐ টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

● কমপক্ষে ৫ কপি প্রতি সংখ্যা নিতে হয়।

● টাকায় ২৫ পয়সা কমিশন দেওয়া হয়।

● ভিপিতে পত্রিকা পাঠানো হয়; ভিপি খরচ বহন করা হয়।

● ভিপি প্রত্যাখ্যান করলে এজেন্সী জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করে এজেন্সী বাতিল করা হয়।

॥ চিলড্রেন্স্ ডিটেকটিভ্ ॥ ২৬ স্ট্রাণ্ড রোড ॥ কলিকাতা-১ ॥ ফোন : ২২-২৭৭০

সাড়ম্বরে শুভমুক্তি

১৯শে ফেব্রুআরি

- দর্পণা
- ভবানী
- বাণ্টী

ও

অন্যত্র

চিলড্রেনস্ ডিটেকটিভ

প্রতিযোগিতা ঃ—

১নং ২০০ শব্দ নিয়ে একটি গোয়েন্দা ধাঁধা লিখে পাঠাও।

২নং তোমার মনের মত গ্রাম্য পরিবেশ রঙ দিয়ে ১০″×৬″ ইঞ্চির কাগজে এঁকে পাঠাও।

তিনটি পুরস্কার ২৫।১৫।১০ টাকা।

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫।৩।৮১'র মধ্যে।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ

আগামী সংখ্যাটি বিশেষ আকর্ষণীয়

২টি কমিকস ২টি প্রতিযোগিতা

সেরা একটি সচিত্র কাহিনী

লিখবেন ঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শক্তিপদ রাজগুরু, অদ্রীশ বর্ধন, আশাপূর্ণা দেবী, মঞ্জিল সেন, এবং শ্রীধর সেনাপতি ও অনেকে।

এ ছাড়া আকর্ষনীয় বিভাগ ও অন্যান্য রচনা

জিম করবেটের বাঘ শিকারের কাহিনী

টারজনকে নিয়ে (কমিকস)

মনেরেখোর বিজ্ঞানের প্রশ্ন মালা

ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস অ্যাডভেঞ্চার প্রবন্ধ রঙিন ছবিতে অলৌকিক কাহিনী নিয়ে ঠিক তোমাদের হাতে মাসের প্রথম সপ্তাহেই তুলে দেব।

দাম দু'টাকাই থাকবে।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ : ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড : কলিকাতা-৭০০০০১ : ফোন ২২-২৭৭০

কি ভাবছেন?

ছেলেমেয়ের লেখাপড়া?
কন্যার বিবাহ?
অথবা
ভবিষ্যতের নিরাপত্তা?
আজই
ফেবারিট
সঞ্চয় প্রকল্পে
যোগ দিন
সেবা
ও
সঞ্চয়ের
একমাত্র
প্রতীক

ফেবারিট

স্মল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
হেড অফিস:
৮৩, পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০১৬,
ফোন ২৪-৬৬৫৩, ২৪-৭২৮১
২১-৩৫৮৮
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মসচিব
শ্রী এন, দে

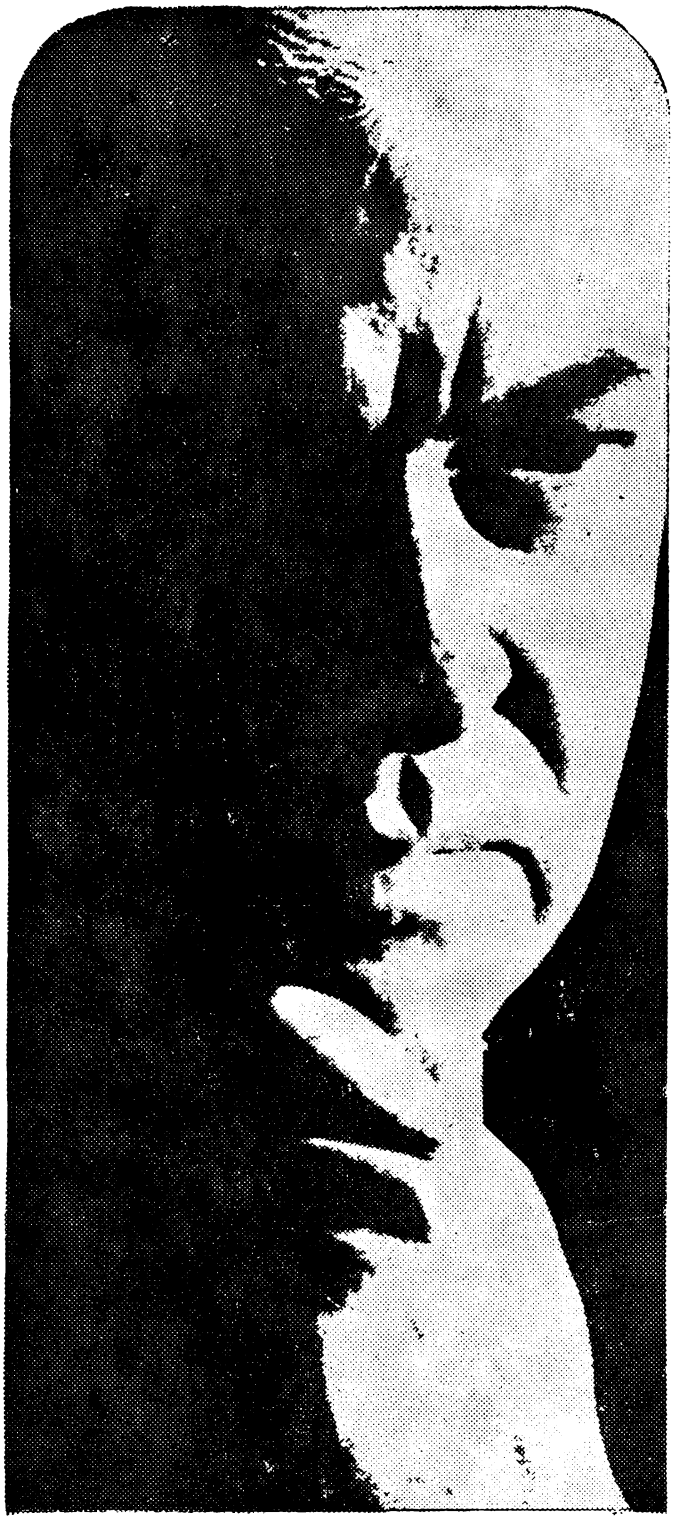

Regd. No. R. N, 32660/77 CHILDRENS' DETECTIVE :: FEBRUARY 82 Rs. 2/- WBSC-135

RESULT OF A LONG AYURVEDIC RESEARCH

OASIS
DOUBLE ACTION
HAIR FERTILIZER
(non-oily hair lotion)

OASIS contains Ayurvedic approved ingredients such as Bhringraj, Ghrita Kumari, Somraj. Kesut, Hasti Danta Churna Mucilage, Egg Yolk, Amlaki, Lemon, Purified Water. According to Ayurvedic Sastras the ingredients used in **OASIS** help to stop falling of hair. It also helps to keep brain cool and to grow fresh hair. Even herbs can clean dandruff. More details inside the phial.

Try compare the characteristic of OASIS And watch how it performs Ayurved Sastra & OASIS

Ask any medical, stationary or departmental Stores for this lotion.

MARKETED BY
CALCUTTA FILMLET ADVERTISING
(MARKETING DIVISION)
BOMBAY • CALCUTTA • PATNA
• CUTTACK Tinkunia Bagicha Cuttack-1
• KANPUR 96/12, The Mall, P. P. N Market 1st Floor, Kanpur 208001

A product of Herbal Research Institute.
Test OASIS
to believe it at our free application centre

SOHINI PRAKASHANI : Phone : 22-2770 : Chief Editor, Amitava Sen
Printer. Publisher & Editor, Mahindra Bose from 26, Strand Road, Cal-1
Printed at Impression & Jayasree Press—Cal-6, Block Royal Halftone Co.
Cover Printed by New Gaya Art Press, Cal-9, Phone : 34-3493